পূজাবার্ষিকী ১৪৩০

বঙ্গশারদীয়া

Dresden, Germany

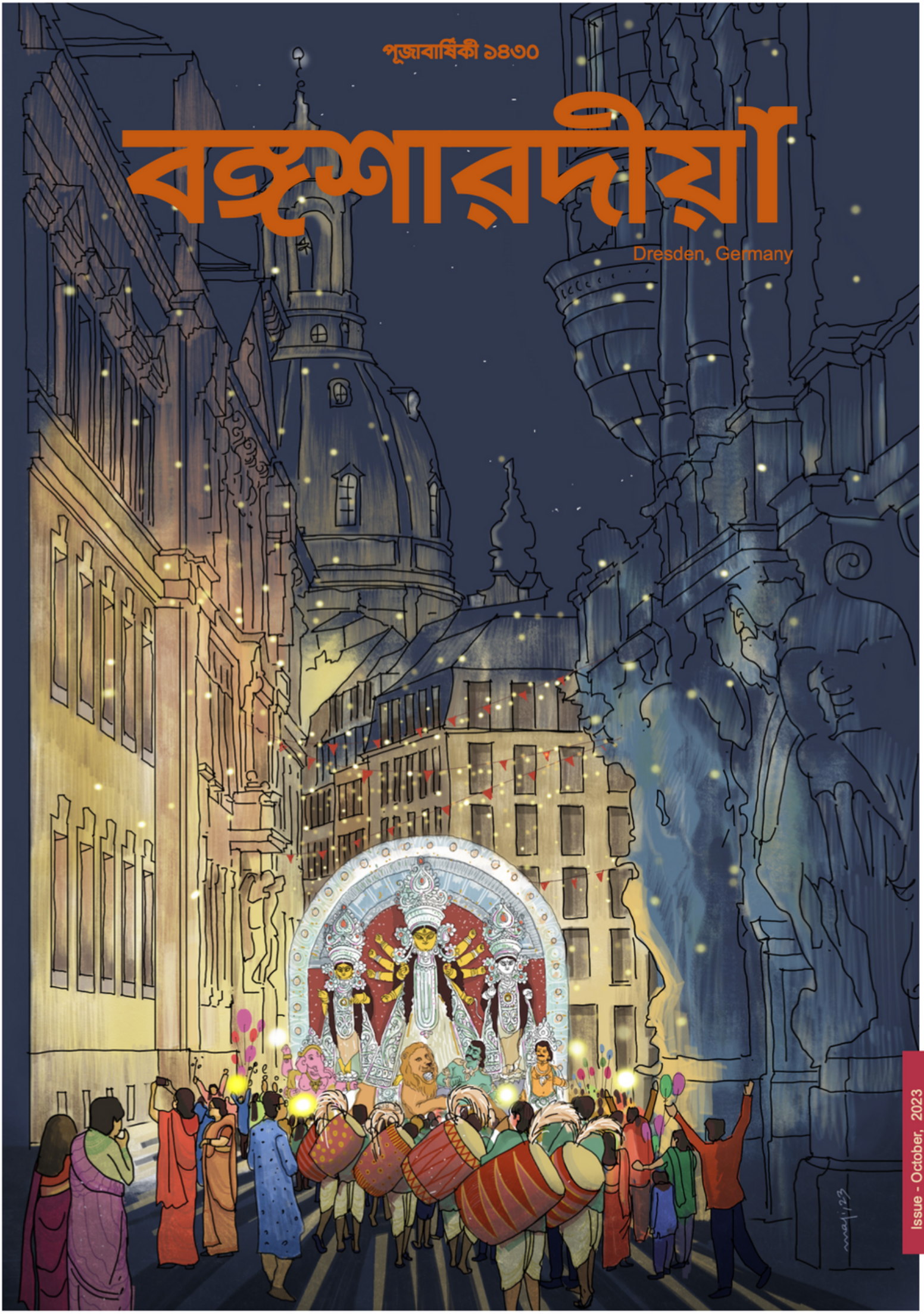

Issue - October, 2023

পটভূমি চিত্র - অর্ক বক্সী
প্রচ্ছদ চিত্র - শুভদীপ মাজি
ভেতরের প্রচ্ছদ - স্নিগ্ধা সাহা
সম্পাদনা এবং সংকলন - তিয়াস সামুই, অর্ক বক্সী

Watermark design - Arka Baksi
Cover Design - Shubhodeep Maji
Inner Cover - Snigdha Saha
Editing and compilation: Tias Samui, Arka Baksi,

© BongoUstav Dresden (BUD) e.V.

I. Foreword from the President

We could bet our last "roshogolla" that no one, absolutely no one, picks up a magazine to devour the President's speech. It's like looking for "mishti doi" in a salad bar – you won't find it! But hey, since you've already made it to the first section, let's give you a warm welcome. Amidst the whispers of anticipation and the gentle hum of excitement, we are celebrating the inauguration of our latest literary endeavour—a Bengali magazine in the heart of Dresden, that promises to be a beacon of culture, art, and expression. It is with great pleasure that we embark on yet another journey of creativity, culture, and camaraderie through the pages of our cherished “Pujo Barshiki” which started only last year. This magazine is a reflection of a small effort to preserve our heritage, foster creativity and inspire our future generations, forging bonds of unity and diversity. Today, as we turn the pages of our first edition, let us savour the words and images that grace these sheets. On this occasion, we wish to extend our heartfelt gratitude to the House of Resources, Dresden+, for their invaluable interest in our project and their generous financial support. Their belief in our mission and commitment to our cause have been instrumental in our endeavours thus far.

Bongo Utsav Dresden (BUD) e.V. officially came into existence in the year 2021, although our journey began in 2019 when we initiated the organization of Durga Puja and other cultural events. Over the past few months, we've had the pleasure of coming together to celebrate a myriad of activities, ranging from gatherings and hiking adventures to cultural events. But what truly stands as the crowning achievement of this period is our pioneering celebration of a “Science Day” in Bengali language right here in Germany. During this remarkable event, we delved into a wide array of scientific topics, all while conversing in our mother tongue, Bengali. It was a testament to our commitment to preserving our cultural and intellectual heritage even in distant lands.

In the course of this year, we have also had to bid farewell to a few of our cherished members. We wish to express our deepest gratitude to them for their unwavering dedication and invaluable contributions, which have played an instrumental role in our success over the years. As in any dynamic community, some will move on to new horizons, while fresh faces will join our ranks. However, one truth remains unaltered: Bongo Utsav Dresden is a timeless entity, forever linked by an invisible bond that transcends time and

space. It is a bond that elevates our personal friendships to new heights and creates a sense of family among us.

In light of this, I extend my warmest invitation to everyone, both old and new, to become a part of Bongo Utsav Dresden. Here, you will not only discover the Essence of Bengal but also become part of a diverse, welcoming, and closely-knit family right here in Dresden. Join us in revelling in our culture, heritage, and the lively mosaic of Bengali traditions. Together, we'll craft lasting memories, build meaningful connections, and ensure that the vibrant spirit of BongoUtsav Dresden remains robust and enduring.

As I was about to wrap up my speech, news of yet another war situation in Europe has unfolded. In times like these, we understand the importance of an escape, a sanctuary where culture, art, and stories can offer solace and respite. Our magazine, amidst the chaos, aspires to be just a refuge, where you can momentarily escape the rising tensions. So, let's embark on this journey together, finding comfort in our shared heritage and the power of storytelling. If you've made it to the end of my ramblings, kudos to you, dear patient reader! You're officially invited to chat with me over a steaming cup of "gorom gorom cha." Let's spill the tea, quite literally!

- Dr. Binit Syamal
President.
BUD e.V.

.

II. সাধারণ সম্পাদকের কলমে

যারা কথামৃত পড়েছে তারা জানে যে "কথামৃত"র লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন প্রথমবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে দেখা করেছিলেন, সাকার-নিরাকার নিয়ে তাদের মধ্যে একটা তর্ক হয়। ব্রাহ্মবাদী মহেন্দ্রনাথের শুধুমাত্র নিরাকারে বিশ্বাসই ছিল না, উনি সাকারবাদকে একরকম কুসংস্কার বলেই ঘৃনা করতেন । তার বক্তব্য মূর্তিপূজা হল এক অন্ধবিশ্বাস, এবং এর থেকে মানুষকে বিরত করাই হলো জ্ঞানী মানুষের প্রথম কর্তব্য । এইরকম পরিস্থিতিতে তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখোমুখি হন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ধমক দিয়েই জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কি বাপু নিরাকার ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছ, যে অন্য লোকের ভুল শোধরাতে যাচ্ছ? যার জগৎ, তিনি শুধরে দেবেন ।"

এখানে লক্ষণীয় হলো যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু বলছেন না যে মহেন্দ্রনাথ ভুল কথা বলছেন। এইরকম উত্তরে অনেকের ধারণা হতে পারে যে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়তো মূর্তি পুজোর বিরোধীই ছিলেন। অথচ আমরা সবাই জানি যে তিনি দক্ষিণেশ্বরে মূর্তি পুজো করতেন। তাহলে এইরকম confusing statementর মানে কি ? আসলে পুরো কথামৃততেই আপাত দৃষ্টিতে এই রকম self-contradicting statement-এ ভরা । মহেন্দ্রনাথ অনেক পরে বুঝেছিলেন যে সাকার-নিরাকার সবই সেই এক, সবই সেই "একমেবঙ্গদিতিয়ং"xxx র লীলা। আমরা যদি অনেক পরেকার একটি ঘটনা দেখি, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ রাজস্থানের রাজাকে মূর্তি পুজোর প্রাসঙ্গিকতা বোঝানোর জন্য তার বাবার একটা ছবিতে থুতু ফেলতে বলে। তার কারণ হিসেবে তিনি রাজারই উদাহরন দিয়ে বলেন যে সেই ছবিতো কাগজ আর কালি ছাড়া তো কিছুই নয়। রাজা তখন বুঝতে পারে যে মূর্তি শুধুমাত্র মাটি-কাঠ-রং আর চুনের সমাহার নয়, মূর্তি হলো মানুষের হৃদয়ের অধিষ্ঠানের প্রতীক, যেখানে তারা তাদের ভালোবাসা জানতে পারে। নাস্তিকবাদীরা ঠিক কি বলবেন জানিনা, কিন্তু আধুনিক যুগে মহান মানুষের মৃত্যুতে আমরা যে তার সমাধিস্থল বা জায়গায় জায়গায় তার ছবি বা মূর্তি গড়ে তুলি, তা মূর্তিপূজার তাৎপর্য কিছুটা বাড়িয়েই তোলে বলে আমার মনে হয়।

এই প্রসঙ্গেই বলি, Milan এর বুকে যখন লোকজন last supper দেখে, তখন কি সে দা ভিঞ্চির শিল্পকলা দেখে না কি ভগবান খ্রীষ্টকে ? Michelangelo র la Pieta বা Brugesর Madonna and the child কি খ্রিস্টীয় দেবতার দেবত্ব প্রকাশ করে নাকি মায়ের আপত্ত সন্তানস্নেহ ফুটিয়ে তোলে ? মাধ্যমিক পরীক্ষায় যখন 'রামের বিলাপ' পড়তাম, কিংবা 'বিভীষণএর প্রতি ইন্দ্রজিৎ', কিংবা আরো বড় হয়ে ' কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' পড়েছি, তখন কি আমরা কোনোদিন এগুলোকে ধর্মীয় রং মাখিয়ে পড়েছি ? বরঞ্চ এই কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না যে রেনেসাঁর সময় আমরা শিল্পকলার যে চরম নিদর্শনগুলো দেখি, ধর্ম তার মূল ভিত্তি। এই সমস্ত কারুকার্য একটাই কথা প্রমাণ করে, শিল্প আর ধর্ম এক দিকথেকে একে অপরের পরিপূরক।

ধর্ম আর শিল্প একদিকে যখন একে অপরের হাত ধরে চলে, অন্য দিকে এর নজিরও রয়েছে যেখানে এরা একে অপরকে মারে। প্রাচীন কালের বিভিন্ন ক্ষমতা বা সাম্রাজ্যলোভী লোকের হাতে শিল্পকলার ধ্বংসের নজির যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আধুনিক কালে বামিয়ানার বুদ্ধ মূর্তির গুড়িয়ে দেওয়া বা বিভিন্ন সুন্দর মন্দির বা মসজিদ ভেঙে দেওয়ার উদাহরন । একথা অনস্বীকার্য, আধুনিক কালে, ধর্মের মোহে অন্ধ হয়ে মানুষ যে জয়ধ্বনি দেওয়া শুরু করেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো মনে পড়ে যায় ..

"পথ ভাবে আমি দেব/ রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে দেব আমি/ হাসে অন্তর্যামী ।"

ছোটবেলায় 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ' নিয়ে আমাদের রচনা লিখতে দেওয়া হতো। একটা গতে ফেলা logical flow তে আমরা লিখতাম যে বিজ্ঞান সব সময়ই ভাল, কিন্তু অভিশাপটা ডেকে আনে মানুষই, তার ব্যাবহারের ধরন হিসেবে। আমার মনে হয়, আমরা যদি কোনোদিন 'ধর্ম আশীর্বাদ না অভিশাপ' এই নিয়ে কোনোদিন চর্চা করি, সেখানেও আমরা সেই একই conclusion এ পৌঁছাব।

আমার মনে হয়, আধুনিক কালের দুর্গা পুজা, ভারতবাসীর বা বিশেষ করে বাঙ্গালীর উৎকৃষ্ট শিল্পসত্তাকেই প্রকাশ করে চলেছে। দিকে দিকে বাঙ্গালী শিল্পীদের যে হাতের কাজের নমুনা পুজোর সময় আমাদের চোখে পড়ে, তা বিশ্বের অন্য কোনো প্রান্তে হয় কিনা আমার সন্দেহ আছে। এই পুজোকে কেন্দ্র করেই মানবজাতির যে বিশাল মিলন সমাবেশ গড়ে উঠে, তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে ? সারা বছরের দুঃখ-কষ্ট ভুলে বাঙ্গালীরা যে এই পুজোতে যোগদান করে তাতে এই উৎসবের মাহাত্ম আরো বাড়ে বৈ কম হয় না। বৈদিক এই মহিলা দেবতাকে কেউ দেখে মায়ের চোখে, কেউ দেখে ভগবানের চোখে, কেউ দেখে এক আশ্চর্য শিল্পকলা রূপে, বা কেউ মাটি-রং-চুনের স্তূপ হিসেবে। যে যেই চোখেই দেখুক, পুজোর এই কটা দিন জাতি-ধর্ম-বর্ণকে অতিক্রম করে মানুষের যে এই বিশাল মিলনমেলা, আধুনিক কালের এইরকম একটা জন আয়োজন আর কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে আমি আরো একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো বাঙালিদের উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি। কলকাতায় কত মণ্ডপের উধাহরন আছে যেখান দুর্গা পূজিত হয় কোনো গির্জার আদলে তৈরি মণ্ডপে, বা অন্য কোনো ধর্মীয় দেবতার আদলে আমরা দুর্গা মূর্তি গড়ে তুলি। আসলে পুজো আমাদের কাছে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, পুজো হলো আমাদের একটা বাঙ্গালী ভাবাবেগ।

সত্যি কথা বলতে গেলে, আধুনিক কালে, বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালিদের কাছে, বাঙালিয়ানা উদযাপনে দুর্গা পুজো একটা মূল অঙ্গ। এই পুজো ঘিরে বাঙ্গালী শিল্প-সংস্কৃতির যে উৎকর্ষতার নিদর্শন গড়ে ওঠে, তা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মত ড্রেসডেনের মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আমরা এবারে পঞ্চম শারদোৎসব পালন করতে চলছি। এবারে বঙ্গ-উৎসব ড্রেসদডেনের মূল আকর্ষণ মা দুর্গার মৃন্ময়ী রূপ। এই মূর্তির প্রধান কারিগর হলেন কুমোরটুলির বিখ্যাত শিল্পী শ্রী প্রশান্ত পাল মহাশয়। তার হাতেই গড়ে উঠেছে ড্রেসেডেনের এই মৃন্ময়ী মূর্তি।

ছোটবেলায় মহালয়ায় শুনতাম, মা "মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী" হয়ে ওঠে। তখন মানে বুঝতাম না। অনেক পরে বুঝেছি যে চিন্ময়ী বলতে কি বোঝায়। আমাদের মা কিন্তু এখনও মৃন্ময়ী রয়েছে, চিন্ময়ী করে তোলার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের ঘাড়ে। এই অনুষ্ঠানে যদি সবাই সতস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে, তবেই তা সম্ভব। আসুন আমরা সবাই নিজেদের মনের সব দূরত্বকে সরিয়ে রেখে এই মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করি। বাঙালিয়ানা উদযাপন করার এরথেক বড় সুযোগ কি আর আছে ? যারা rational minded তারা না হয় বাঙালিয়ানার শিল্প দেখতে আসুক; আর যারা মায়ের সন্তান, তারা আসুক মাকে দেখতে। আর যারা এর মধ্যে কোনোটাই নয় তারা আসুক ভুরিভোজ করতে ।

- ডা: প্রণয় মণ্ডল
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গ উৎসব ড্রেসডেন

BUD's Cultural Voyage: A Year of Tradition, Celebration, and Togetherness

Embracing the rich tapestry of Bengali culture and traditions in the heart of Dresden, Bongo Utsav Dresden (BUD) e.V. stands as a beacon for cultural preservation and celebration. Throughout the year, BUD has woven a colorful narrative of events and festivals, each echoing the vibrant rhythms of Bengal. As we approached the close of this year, the anticipation for BUD's annual magazine, a tradition inaugurated just last year, grows. Join me as I take you through all the activities and events that BUD has gracefully unfurled since the release of our previous magazine and reminisce about the cherished moments and the communal spirit that defined each of BUD's endeavours.

1. Durga Puja, 2022: A Triumph of Good Over Evil

Durga Puja is more than just a festival; it's a deeply ingrained emotion for every Bengali. In 2022, BUD made sure that this emotion was experienced in all its richness and depth in city of Dresden. The members of BUD transformed Heimathaus Cossebaude into a Puja Mandap, adorned with handcrafted decorations.

Worshipping the divine Mother, Cossebaude, Dresden 2022

The rituals spanned over three days, from 'Sashti-Saptami' and ‘Asthami’ to 'Nabami-Dashami'. Over 300 participants, hailing from various parts of Germany and donned in traditional attire, immersed themselves in the celebration. The members of BUD prepared Prashad and lunch every day for all attendees, serving a plethora of dishes free of cost.

Left - Several BUD members busied themselves preparing khichudi for attendees amidst the panoramic hilltop garden in Freital during Durga Puja in 2022. **Right** - Participants of Durga Puja 2022 engaging in "Sindur Khela" on the final day (Dashami) of the festival.

Besides the religious observances, the attendees enjoyed cultural programs, danced to the mesmerizing beats of the 'dhak', and sang heartfelt devotional songs. On the second day of the event, BUD proudly introduced their inaugural sharodiya magazine, “Shilpaangkriti”. However, this festival was not merely a religious gathering; it was a vibrant showcase of culture. In 2022, BUD also hosted a distinct cultural event at the Riesa efau hall after the durga puja celebration, encompassing two primary segments. The initial part was graced with captivating dances performed by BUD members, while the latter section was predominantly dedicated to singing and poem recitations. Moreover, throughout the event, attendees were treated to a variety of snacks, enhancing the overall festive and engaging atmosphere

2. Science Day, 2022: Celebrating Bengal's Intellectual Heritage

While Bengal is known for its cultural festivities, its contributions to science and the world of intellect are unparalleled. BUD's 'Science in 2022' event highlighted this. It began with an opening speech from the president of BUD and showcased why science is important for bengali, followed by interactive

presentation from multiple bengali scientist or working professionals working in Dresden. An exhibit dedicated to Sir Jagadish Chandra Bose, the father of modern Indian science, was a highlight.

Poster from BUD's Science Day 2022, paying tribute to renowned Bengali scientists

BUD members pose for a group photo during the Science Day event, held in the Physics Department at TU Dresden

3. Saraswati Puja, 2023: Ode to the Goddess of Knowledge

BUD's celebration of Saraswati Puja was a tranquil and emotive affair, reverberating with devotion and cultural fervor. The event, held at Riesa efau, saw BUD members setting up a majestic poster of Goddess Saraswati for worship. Following the solemn rituals, the atmosphere shifted to a more festive one with the inauguration of a Bengali bazaar, where attendees savored the delectable Bengali street food, fuchka. Subsequently, BUD provided a sumptuous lunch for all, a testament to their commitment to hospitality.

Left - Devotees Engaged in Worship During Saraswati Puja 2023. **Right** - A scene from the stage drama "Bhushundir Mathe" by BUD members at Saraswati Puja 2023

4. ***Excursion to Malter Lake, 2023: Community Bonding Amidst Nature***

BUD. is not merely a socio-cultural association focused on festive occasions but also for organizing numerous summer activities, unveiled a delightful excursion to Malter Lake as one of this year's standout events. The tranquil Malter Lake, cradled amidst the lush verdancy close to Dresden, tendered an idyllic backdrop for this charming adventure, offering participants a serene retreat from urban chaos and a glimpse into nature's exquisite splendor. Navigating through the enchanting pathways to this scenic sanctuary, participants were offered two distinct yet equally appealing travel alternatives. A vigorous hike through the mesmerizing Rabenauer Forest offered some an intimate encounter with nature's multifaceted beauties, while others, seeking a more leisurely pace, traversed the same lush forest aboard the historical steam rail, each clank and puff resonating with tales of bygone eras, inducing a rich, nostalgic charm. Upon arrival, Malter Lake, with its crystalline waters and gentle ambiance, extended a warm, silent welcome to us. Some opted to explore its silent depths and whispering waves

up close, with boats gliding seamlessly over the mirror-like surface, while others succumbed to the refreshing embrace of its calm waters with a leisurely swim. But the day transcended mere aquatic adventures, emerging as a tapestry woven with threads of camaraderie and relaxation. Gathering for a quaint picnic under the whispering leaves, participants shared laughs, stories, and culinary delights, embedding warmth into the tranquil surroundings.

Left - Posing with the Weißeritztalbahn day at Malter Lake

Right - BUD members after a well spent

The return journey aboard the historical steam rail not only marked the conclusion of a beautiful escapade but also provided a moment of reflection, allowing the absorption of lingering memories and experienced tranquility. Ultimately, the journey to Malter Lake was more than an excursion; it was a symphony of adventures, relaxing moments, and united smiles, composed alongside nature's most splendid settings, and is sure to linger in the memories of all BUD members.

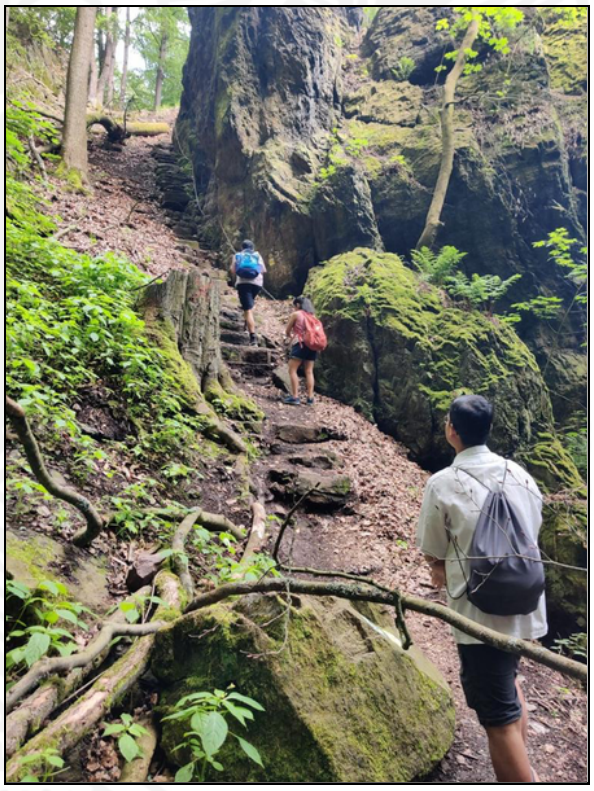

BUD members hiking to the Somsdorfer Klamm

5. Summer Grill Soiree, 2023: Riverside Revelry with BUD

In the luminous embrace of summer, BUD unrolled its tapestry of togetherness once again, orchestrating a vibrant summer grill party on the enchanting banks of the Elbe River. Earlier this year, members of the community were gracefully immersed in a delightful afternoon-to-evening gathering, where they were greeted with an array of succulent grilled delicacies and an atmosphere saturated with congeniality. With a heartfelt and generous offering, BUD provided all food and grill materials complimentary to its members, thereby elevating the event beyond a mere social gathering. The gentle currents of the Elbe, paired with melodies of shared laughter and stories, crafted a milieu where connections deepened and spirits were lifted. In reflection, this occasion was not merely a party; it was a cherished episode of shared experiences, encapsulating BUD's unwavering spirit of unity and camaraderie.

Scenes from our grill party - a collection of happy faces

6. Potluck at the Big Garden, 2023: Culinary Delights and Spirited Games Amidst Dresden's Greenery

In the verdant sprawl of the Big Garden of Dresden, BUD wove yet another tapestry of community and camaraderie by hosting a series of potluck gatherings, accentuating the summer with flavors and frolic. Members enthusiastically arrived, bearing dishes that were not only a feast for the palate but also a showcase of their culinary artistry, each platter telling a story of unique flavors and heritage. The potlucks weren't merely a gastronomical journey but also a spirited celebration of talents and hobbies. Against the backdrop of nature's lush and leisurely canvas, members delved into various sports activities. The gentle caress of the summer breeze witnessed the vigor of football matches and the swift, engaging moves of badminton games, among other lively endeavors. These gatherings at the Big Garden were not merely events; they were a fusion of diverse cultures, tastes, and joyful physical activities, all under the tranquil embrace of nature, strengthening the bonds amongst BUD members amidst the verdant settings.

Clockwise from top left: Members warming up with stretches before the football match.; BUD's young members savoring a feast at the potluck.; Tired but elated faces.

As BUD. reflects on a year of vibrant cultural celebrations, spiritual gatherings, and hearty camaraderie, we look back with gratitude and forward with anticipation. Each meticulously orchestrated event, from joyous festivals and serene excursions to culinary adventures and intellectual engagements, has not only reverberated the rich rhythms of Bengali culture but also woven a cherished tapestry of shared experiences and memories amongst the Bengali community in Dresden. The forthcoming release of our annual magazine promises to encapsulate these myriad hues of our collective journey, signaling not an end but a pause to cherish the past and embrace the future. Here's to BUD, our collective spirit of unity and celebration, and to another year of safeguarding and reveling in the splendid mosaic of Bengali traditions and togetherness. May our upcoming chapters be yet more vibrant, and our bonds of community grow ever stronger.

Jyotirmaya Ijaradar
Treasurer.
BUD e.V.

BUD e.V. sincerely thanks House of Resources, Dresden + for supporting us in our endavours

House of Resources Dresden+ | Schweizer Straße 32 | 01069 Dresden

Telefon: 0351 40766253 E-Mail: info@hor-dresden.de

BUD e.V. sincerely thanks all its sponsors and partners

Telecast and Print Partners

বর্তমান

A traditional ‘Alpona’ (painted motif)

সম্পাদকীয়

এক কথায় যদি বলা হয় বাঙালির আইডেন্টিটি বলতে কী বোঝো? তাহলে বোধহয় প্রথম যে তিনটে জিনিস মনে পড়বে তা হল মিষ্টি, মাছ এবং দূর্গা পুজো। বাঙালিরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, তারা এই দুর্গাপুজোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রবাসে ক্রমশ বেড়ে চলা দুর্গাপুজোর সংখ্যা। এ পুজোর শুরু হয় কিছু মানুষের উদ্যোগ নিয়ে তারপর তা নিজস্ব একটি জীবন পেয়ে বেড়ে চলে তার আপন গতিতে। ঠিক এইরকম একটি পুজোর গল্প ড্রেসডেনে বঙ্গোৎসবের আয়োজিত শারদ উৎসব। ২০১৯ এ পথ চলা শুরু করে এ বছর আমরা পঞ্চম বছরে পা দিতে চলেছি। প্রথমবার পুজো হয়েছিল মা দুর্গার ছবিতে, দ্বিতীয়বার নিয়ে আসা হয় ছোট্ট একটি মাটির দুর্গা প্রতিমা। এইভাবে চার বছর নিয়ম নিষ্ঠা মেনে পুজো করার পর সবার মনের ইচ্ছে হয় যে এবার মাকে কুমোরটুলি থেকে আনতে হবে। আগের বছর পুজো শেষ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় প্রস্তুতি এবং অবশেষে জাহাজে চেপে কুমোরটুলি থেকে মা এসেছেন ড্রেসডেনে। প্রতিবছরের মত এবারও ড্রেসডেনের সমস্ত বাঙালিরা মেতে উঠবে শারদ উৎসবে। সঙ্গে থাকবে পুজোর নিয়ম, পুষ্পাঞ্জলি, একসাথে মিলে ভোগ খাওয়া, গান, আবৃত্তি, নাচ ও অনাবিল আনন্দ। পুজোর এই চার দিন দেশে না ফিরতে পারার মন খারাপটুকু ভুলে থাকবে ড্রেসডেনের সকল বাঙালি।

আর পুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে পুজাবার্ষিকী। সেই প্রকাশের অপেক্ষা - কবে নতুন কাকাবাবুর গল্প পড়ব, হারিয়ে যাব প্রফেসর শঙ্কুর সাথে অজানা দেশে, মিতিন মাসীর প্রশ্রয়ের বকুনি খাবো - সে এক আলাদা অনুভুতি। আমাদের পরের প্রজন্ম, যারা প্রবাসে বড় হয়ে উঠছে, তারা যাতে সেই একই রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারে তারই প্রচেষ্টা আমাদের এই শারদীয়া পূজাবার্ষিকী। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সমস্ত লেখক, কবি ও চিত্রশিল্পীদের আমাদের পাশে থাকার জন্য। এবার অপেক্ষা আপনাদের মানে আমাদের পাঠকদের মতামতের জন্য। আশা করি আপনাদের মন জয় করতে আমরা সক্ষম হবো। শুভ শারদীয়া।

We are back with our second edition of our annual magazine. This year we bring to you a kaleidoscope of writings that capture the spirit of the festive season. We hope that each of you enjoy this edition as much as we enjoyed reading and compiling all the submissions. We wish you a happy and prosperous year ahead. Until next time...

Magazine Committee
2023

সূচিপত্র

বিবিধ

আমার দুর্গাপূজা
তিয়াস সামুই

04

Memories
Binita Sengupta

17

The Miracle on the Hudson
Aaryan Kannan

20

বিজ্ঞানের দায় ও বিজ্ঞানীর দায়িত্ব
রাজীব সরকার

28

Let me share
Prantik Mahajan

38

একটি রাতের ইতিকথা
ইনজামামউল আরিফ

42

Durga Puja for a Bengali
Binita Sengupta

45

কবিতা

ধর্ম
পাপিয়া দাস

07

শপথ
সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

07

শৌখিন কবি
পাপিয়া দাস

37

অন্ত্যমিল
সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

37

স্পর্শ
একটা গল্প হোক
দেবযানী গুহ বসু

38

Found In The Lost
Sudipta Paul

44

মহালয়া: আগমনী সুর
অমিতাভ ব্যানার্জী

47

The Foe Of Pride
Madhurima Jana

51

ভ্রমণ কাহিনী

Journey to Hidden Beauty: The Manor Dam Adventure
Avadhesh Mishra

05

A Short Visit to the Centre Védantique Ramakrishna – Paris
Basudeb Talapatra

08

আড্রিয়াটিকের তীরে
শুভ্রদীপ মণ্ডল

12

A Trip to Rügen
Sanghavi Ray

34

My Europe Tour Story
Abhinay sawant

41

Hanukkah: The Jewish Diwali?
Yudhajit Bhattacharjee

48

ছোট গল্প

হারানো সময়
প্রীতম রায়

01

নাসিরের মতামত
রাজীব সরকার

22

হিঙুডী রাখো
চৈতালী বর্মন

31

ভূতের সেকাল - একাল
কমল সামুই

39

দুগ্গা দুগ্গা
শূন্য

53

Congregation - Arka Baksi

হারানো সময়

প্রীতম রায়

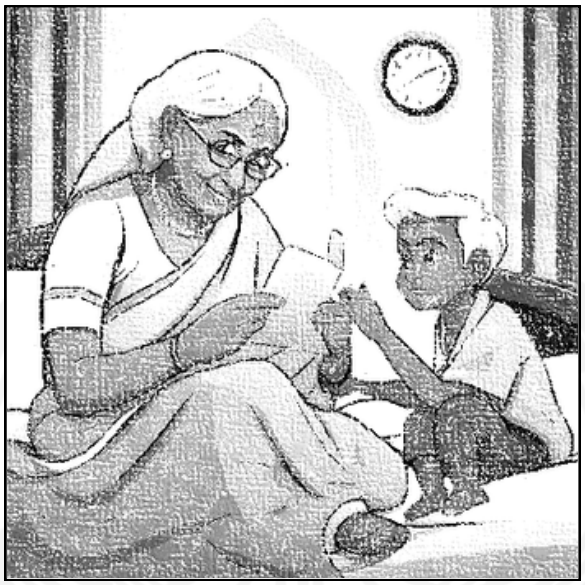

-ও ঠাম্মা, বলো না তারপর কি হলো ?

-তারপর ? তারপর বড় খোক্কস রেগে গর্ গর্ করে বললো, "বটে ! ঘরে কে জাগে ?

লালকমল বললো,

"নীলকমল জাগে, লালকমল জাগে

আর জাগে তরোয়াল

দপদপ করে ঘিয়ের দীপ জাগে- কার এসেছে কাল?”

-ধুর ঠাম্মা, রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ বলছিলে তো! লালকমল নীলকমল এলো কোথা থেকে! তুমি না হয় ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পটাই বলো।

ও হ্যাঁ তাই তো, তারপর বড় বড় ডানা নিয়ে সে কী ভীষণ যুদ্ধ! চারিদিক অন্ধকার....

রাক্ষস দল দল ছুটে আসতে লাগলো....

“হাঁউ মাঁউ কাঁউ

মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ

ধরে ধরে খাঁউ... ”

ছোট্ট তপু শীতলপাটীতে ঠাম্মার পাশে শুয়ে মুখচাপা দিয়ে ফিকিফক্ করে হাসতে থাকে। ঠাম্মা আবার দুটো গল্প মিশিয়ে ফেলেছে। দূর থেকে জেনারেটরের শব্দ ভেসে আসে। লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে, মাঝে মাঝে খোলা জানালা দিয়ে কয়েকটা জোনাকি ঘরে ঢুকে উড়তে থাকে।

এরম রোজই ঘটে। ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করতে করতে ঠাম্মার গলা জড়িয়ে আসে, হাওয়া করতে করতে একসময় হাতপাখাটা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে। তপু অপেক্ষা করে ঠাম্মার ঘুম ভাঙার। সন্ধ্যেবেলা অনেক তাড়াতাড়ি পড়াশোনা শেষ করে ঠাম্মার কাছে গল্প শুনতে এসেছে, এত তাড়াতাড়ি

তাই ঠাম্মাকে ঘুমোতে দেওয়া যায় না।তপু এপাশ ওপাশ করে অনেক চেষ্টা করে তক্তাপোশটাকে নাড়াতে, একবার করতে পারলেই ঠাম্মার ঘুম কেটে যাবে, আবার গল্প শুরু হবে।
পাশ ঘুরতেই ঠাম্মার হাতটা পিঠে এসে ঠেকল।
-বাবা গা'টা কি গরম ! জ্বর না কি রে?
-নাহ এমনিই গরম। ঠাম্মা আশ্বস্ত হয়ে এক হাতে হাতপাখাটা খুঁজে পেয়ে জোরে জোরে হাওয়া করে দেয়।
এরপর ঠাম্মা তপুর পিঠে হাত বোলায়, সারা পিঠে ঘামাচি খুঁজে বেড়ায়, মাঝে মাঝে চুলকেও দেয়। টেবিলের ওপর রাখা অ্যালার্ম ঘড়িটায় কাঁটাগুলো অন্ধকারে ন'টার ঘরে জ্বলজ্বল করে। একটু পরেই বাবা ফিরবে ঘামে ভেজা টেরিকটের জামা পরে। সময় পেলেই বাবা তপুকে পিঠ চুলকে দিতে বলে। কি আরাম পায় ভগবানই জানে! দাদুও মাঝে মাঝে মোষের শিংয়ের তৈরি ইয়া লম্বা একটা হাত দিয়ে পিঠ চুলকায়। বাবাদেরই বোধহয় পিঠ চুলকায়, কই তপুর তো এরম আরাম লাগে না! শিল-নোড়ায় বাটনা বেঁটে বেঁটে রোজ রান্না করা ঠাম্মার হাতটায় কিন্তু বেজায় কড়া, হাত বোলানোর সময় মাঝে মাঝেই তপুর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পান খাওয়া ঠাম্মার মুখের এলাচ, কর্পূর আর মিষ্টি জর্দার গন্ধ তপু বালিশের মধ্যে পায়, ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

-অ্যায় যে মিস্টার তপেশ, কি কাণ্ড! এর মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? এসির লোকগুলোর কাজ হয়ে সুদীপ্তা, মানে তপেশের স্ত্রী পাশের ঘরে অফিসের কাজে বসেছে। তপেশও নিজের ওয়ার্কিং টেবিলে বসে বসেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠিক খেয়াল নেই। পরনের গিজা কটনের জামাটা ঘামে পুরোই ভিজে গিয়েছে । এসির সার্ভিসিং-এ এসেছিলো লোকগুলো। এই পেল্লাই বহুতল ফ্ল্যাটের এয়ার টাইট জানালাগুলো আগেভাগে খোলার কথা তপেশের মনে পড়ে নি। তাই একরকম বাধ্য হয়েই জামাটা ঘামে পুরোই ভিজে গিয়েছে । এসির সার্ভিসিং-এ এসেছিলো লোকগুলো। এই পেল্লাই বহুতল ফ্ল্যাটের

জানালাগুলো আগেভাগে খোলার কথা তপেশের মনে পড়ে নি। তাই একরকম বাধ্য হয়েই জামাটা খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল। ল্যাপটপ থেকে লগ আউট করে ঘুম চোখে তপেশ অনেকক্ষন মাথা নিচু করে বসে থাকলো।

এমন সময় পিছন থেকে ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ করতে করতে দুটো টলমলে পা তপেশের পেছনে এসে দাঁড়াল। রুপোর বালা পড়া ছোট্ট একটা হাত তপেশের পিঠ বরাবর উঠলো ।

-বাবা, তোমার পিঠে এত্তো ঘাম! বলেই নখ দিয়ে ঘামের বিন্দুগুলো নিয়ে সে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলো।

ঠিক তখনই যেন এক টুকরো হারানো সময় ফেরত পেয়ে পরম আরামে তপেশও চোখ বুঁজে ফেললো।

The Goddess awakens - Shibani Punekar

আমার দুর্গাপূজা

তিয়াস সামুই

এই দূর প্রবাসে বসে যখন নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেসে বেড়ানো দেখি - তখনই মনের মধ্যে দুলে ওঠে কাশ ফুলের সারি। কানে ভেসে আসে ঢাকের আওয়াজ, দীর্ঘ শ্বাস এর সঙ্গে যেন পাই শিউলি ফুলের গন্ধ। আর তখনই বুঝতে পারি শারদীয়া দুর্গাপূজা এসে গেছে। আমরা বিদেশে বসবাস করেও এই উৎসবে মেতে ওঠার চেষ্টা করি আমাদের মত করে। আয়োজন সামান্য হলেও প্রাণের আকুতি কোন অংশে ও কম নয়। নিয়ম মেনেই মায়ের চরণে আমরা অঞ্জলি দিয়ে থাকি। সারা বছরের কর্ম ব্যস্ত জীবনের মধ্যে ও সবাই মিলিত হবার চেষ্টা করি। মহাশক্তি মহাদেবী দুর্গার মহাপুজা একটি মহামিলন আর সংহতির মহা উৎসব। বাঙালির জীবনে এই মহোৎসবের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। মায়ের পুজোর আনন্দের জোয়ারে জাতি - ধর্ম - সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধি ঘুচে যায়। সবাই একসঙ্গে মাতৃ আরাধনায় মেতে ওঠে। পূজা প্রাঙ্গণ মহামানবের মিলন তীর্থে রূপান্তরিত হয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হয় এই মহা পূজা। পূজা আসলেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।

ঘরের মধ্যে যেমন ঘর থাকে, তেমন আমারও দেশের মধ্যে দেশের বাড়ি আছে। পুজোর সময় আমরা চলে যেতাম দেশের বাড়ি জয়রাম বাটিতে (শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর পূণ্য জন্মস্থান) । সেখানে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গা পুজো। অষ্টমীর সকালে হয় কুমারী পূজা। সেখানে প্রতিমার সঙ্গে একটি বাচ্চা মেয়েকে দেবী রূপে পূজা করা হয়। কৌতূহলী হয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ১৯০১ সালে মা সরদার উপস্থিতিতে ৯ জন কুমারীকে পুজো করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই থেকে চলে আসছে এই প্রথা। এখন একজন কুমারীকে পূজা করা হয়। দেবীকে মৃন্ময়ী রূপে আরাধনার পাশাপাশি কুমারীর মধ্যে মাতৃ রূপ দর্শন, এই প্রথা মেনেই প্রতি বছর সব রামকৃষ্ণ মঠে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। এই প্রথার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শাস্ত্র এবং পুরাণে। শাস্ত্র এবং পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, কোলাসুর কে বধ করার মধ্য দিয়ে কুমারী পূজার প্রচলন শুরু হয়। শোনা যায়, কোলাসুর একসময় স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করায়, বিপন্ন দেবকুল মহাকালির শরণাপন্ন হয়। দেবতাদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে দেবী পুনর্জন্মে কুমারী রূপে কোলা সুরকে বধ করেন। এই প্রথা অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু এখন ঘরের দূর্গাদের কি অবস্থা! এখনও কন্যা ভ্রূণ হত্যা অব্যাহত। নারীদের ওপর অত্যাচারের কোনো কমতি নেই। তাই এই পুজোর মাধ্যমে দেবীকে যেমন প্রণাম জানাবো,তেমন নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান অটুট রাখার অঙ্গীকার করব।

পুজো শেষে সবার মন খারাপের পালা। তবুও আনন্দের রেশটুকু আমাদের দৈনন্দিন যাপনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। বিসর্জনের সুর আগমনীর গান হয়ে উঠুক আসছে বছরের জন্য। সকলের মঙ্গল কামনা করি। সবশেষে সবাইকে জানাই শারদীয়ার প্রণাম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Journey to Hidden Beauty: The Manor Dam Adventure

Avadhesh Mishra

Last weekend, my family and I embarked on an adventure to a remote and unexplored place known as Manor Dam. The journey was quite pleasant, and this hidden gem is nestled along the Mumbai-Ahmedabad highway. Our decision to visit this place was rather spontaneous; we had no concrete plans, and uncertainty loomed over us. After all, it was a 100-kilometer drive from our home, and the monsoon rains were pouring relentlessly.

After approximately two hours of driving, Google Maps directed us to take a left turn, diverting us from the highway. As we followed this route, the road gradually narrowed, and doubts began to creep into our minds. We questioned whether we should continue or turn back. The landscape transformed, and we found ourselves on village roads, passing through small tribal communities. Soon, the surroundings became enveloped in lush greenery, with no signs of civilization. It felt as though we were on our own, with no one to offer guidance.

Manor Dam

Just as we were beginning to doubt the reliability of our GPS, a motorbike appeared on the road ahead. We stopped and approached the riders, inquiring if there was indeed a dam ahead. To our relief, they confirmed its existence but advised us to park our car and continue on foot for about 300 meters to get a glimpse of it.

With renewed hope, we followed their instructions and, after a short ten-minute hike, arrived at our destination. What we encountered left us utterly mesmerized – the scenic beauty of Manor Dam was beyond our wildest expectations. Our weekend trip had turned into a resounding success, and we relished every moment of the breathtaking natural beauty. It was a memorable experience, and we cherished the time spent with our family.

A journey -Moumitha Saha

ধর্ম

পাপিয়া দাস

ধর্ম তোমার , ধর্ম আমার
ধর্ম বুঝতে! জীবন কাবার।
মানুষ তুমি নিজে বোঝো
মানুষ তুমি সত্যি কি ?
একই আকাশ , একই বাতাস
বাস ও তো সেই ধরিত্রী ।

ভাষা , বর্ণ , জাত , ধর্ম
হোক না ভিন্ন, হোক না অন্য
জন্ম - মৃত্যুর জীবন যাত্রা
কেই বা করবে অমান্য।

ধর্ম তোমার , ধর্ম আমার
ধর্ম শুধুই পোশাক সবার ।
সংস্কার,আর আচার বিচার
গণ্ডি সরুক মনের খাঁচার ।
বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা ভরে
মনুষ্যত্বের বাঁধন মুড়ে,
ধ্বজা উড়ুক
জন জীবন সভ্যতার।

শপথ

সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

আয়োজনে কোনো কমতি রাখিনি আমি,
নিবেদনে তবু কে যেন দিয়েছে মাটি,
সে মাটিতে ফুল ফুটবেও সে তো জানি;
কিন্তু জানিনা সার-জল কত খাঁটি।

বেপরোয়া দিনে ঝড়কে করেছি সাথী।
মাঝেমাঝে তবু থমকে গিয়েছে গতি--
তবুও সে ঝড়ে উড়ে যাবে বনবীথি--
কিন্তু আগামী খুঁজে নেবে তার যতি।

আমি তো লিখেছি সারাংশ ঠিক করে।
যদিও কলম সরে গেছে মাঝেমাঝে।
তবু শিরোনাম মুক্ত আকাশে ওড়ে--
দুরন্ত মেঘ জল টেনে আনে সাঁঝে।

দুহাত বাড়িয়ে ধরেছি শিশিরকণা,
হাতের তালুতে যদিও মিশেছে ঘাম;
দুয়েতে মিশিয়ে আমার স্বপ্ন বোনা,
নতুন সকালে লিখবো সর্বনাম।

A Short Visit to the Centre Védantique Ramakrishna – Paris

Basudeb Talapatra

Being the devotees of the Holy Trio, Sri Ramakrishna, the holy Mother Sarada Devi, and Swami Vivekananda, it has been an indispensable part of our tour program to visit the centres of Ramakrishna Math and Mission (RKM) for the last few years. In India, it is easy to find the centres of RKM representing a symbol of selfless service to mankind in different corners of the country. The basic principle followed by RKM is 'Atmano mokshartham jagat hitaya cha' (a sloka from the Rig Veda, which translates to for the salvation of our individual self and for the well-being of all on earth). The 'jagat hitaya' (well-being of all on earth) part consists of the physical, mental, and spiritual development of mankind which is reflected by the benevolent activities of RKM through running schools, colleges, hostels, hospitals, industrial training, and many more along with regular spiritual discourses. All the activities are very much relevant in a developing country like India. Interestingly, the branches of RKM, mostly named Vedanta Centres in foreign countries, are also playing a pertinent role in Western civilizations. By the grace of the Holy Trio, this was our first opportunity to travel outside India. The primary interest was to visit our son in Dresden, Germany along with trips to a few European cities.

Entrance of the main building of the Centre Védantique Ramakrishna – Paris

While planning the trip, we decided to stay in the Centre Védantique Ramakrishna (CVR) – Paris which is a branch centre of RKM, India. We followed the website of CVR and emailed for their permission to spend 2 nights (3 days) on the campus. We received a reply with a warm welcome and consent to our request. This was the time when the interest in our Europe trip was augmented by leaps and bounds. At the back of my mind, it was a mild thirst to experience the profound impact of the teachings and values of Sri Ramakrishna on the Western community so that such a non-profit organization, largely funded by the devotees, functions seamlessly even in the heart of Europe.

It was 17th of August 2023, and we started from Zurich, Switzerland to travel to CVR -Paris. We had a splendid four-hour trip from Zurich main station to Paris Gare de Lyon by the famous TGV high-speed (bullet) train. CVR is situated at around 40 km. away from Gare de Lyon. Following the pre-received information, cross-verified by Google, we had to come to Gare du Nord to catch the Tournan bound RER-E train (Magenta line). It took around 40 minutes till we alighted at Gretz-Armainvilliers. It was a sunny afternoon when we walked for around 10 minutes after crossing the railway bridge to reach our most awaited destination. Despite the absence of a large nameplate at the entrance, it was not difficult to identify CVR as it resembled the picture given on the website. It's a huge (unable to predict the area) premises full of greeneries and flowers welcoming the devotees. We passed by the parking lot full of cars which suggested the presence of a handful number of people inside, yet quite tranquil. A concentrated spiritual bliss resulted due to the spiritual practices of the monastic members and the devotion is reflected in the serenity of the campus. We were well received by one of the volunteers at the entrance office of the centre. It was around 3 pm in the afternoon and naturally, we were a bit tired and hungry. The room keys were handed over to us and we felt connected when the volunteer told us that lunch dishes were kept separately for us. Following her suggestions, we washed our hands and directly moved to the dining table. It was purely Bengali vegetarian food including rice, dal, and vegetable with 'Payesh' (mistanna) as dessert. After lunch, another volunteer showed us our allotted rooms. She was also very polite to invite us to take part in the evening tea and prayer at the shrine. It took a while for us to get refreshed and then attended the evening prayer directly skipping the evening tea session. We entered the shrine and found an ambiance of divinity as expected in RKM centres. The cleanliness, nice decor,

silence, aroma of the incense stick, and meditating devotees under the holy feet of the Holy Trio elevated the spiritual fervor of the shrine. That was the first time we saw around thirty devotees of different age groups who joined there for a spiritual retreat over that weekend. We joined them and the evening arati started around 6pm. It was very surprising for us to hear flawless Sanskrit pronunciation of the hymns by the French devotees throughout the entire program. It proves their respect and devotion to the teachings and principles imparted by CVR. Finally, the program ended with a short reading of 'Sri Ramakrishna Kathamrita' translated into French. Soon after leaving the shrine, most of the devotees started their karmayoga and got engaged in preparing the dinner. We went for a short walk through the greens and woods to explore the vast premises of CVR. We came back when the bell rang for dinner just before the sunset. It was really a cherishing moment to enjoy the food there with the local devotees. This was also the first time we got the opportunity for a short discussion with Swamiji, in charge of CVR. He was very kind to ask about our journey to CVR and comfort there. Finally, he informed us about the time of morning arati for the next day. The group of devotees went for a short walk in the local vicinity while we were sitting with some of the other devotees and exchanging our views after dinner. The main gate of the premises was closed around 9:30 pm after the group returned. Everybody went back to their allocated rooms and the light of the office building was switched off. Thus, the first day ended pleasantly.

Cattle farming at Centre Védantique Ramakrishna – Paris

In the next morning, our son participated in the morning arati where the primary focus was japa and meditation with little rituals. We joined directly at the breakfast table where varieties of bread, croissants, milk, tea, Coffee, and fruits were arranged and to be self-serviced. After breakfast, we got the opportunity again to talk to Swamiji and expressed our desire to have some discussions with him and sought his appointment. He invited us to his office at 10:30 am. As we became known faces to the other devotees by that time, we had long discussions with them and were trying to understand the driving force for which they celebrate the spiritual retreat. Truly speaking, it was just a big family there and we couldn't feel any difference in language, culture, and skin. We realized a oneness among all and remembered that Sri Ramakrishna used to say that there was no religion for bhaktas (disciples). After that, we went to the shrine and offered pranam to the lord. After taking a small rest in the room, we visited Maharaj's office on time. We mentioned our concern to him regarding reaching Paris Gare de l'Est railway station the next morning by 6:30 am to catch our train for returning to Dresden. He understood our points and added that local trains reaching Paris on Saturday early morning can also get cancelled without prior notice. Thus, he felt logical for us to move to a hotel close to Paris. Then Maharaj informed us about the activities of CVR including hosting inter-religion meetings, agricultural activities, cattle farming, and a course on Ayurveda (every Sunday) inside the campus. We had reluctantly shortened our conversation and took his opinion for a short visit to the premises before lunch. After going back to the room, we quickly prepared ourselves for moving to Paris and packed our luggage. This was also the closing ceremony for the devotees attending the spiritual retreat. So, there was a gala lunch followed by making the campus ready for the next program by performing karmayoga including cleaning the dining area, individual rooms, toilets, and placing the linen in the laundry room. We had to bid CVR adieu after offering our respect to the lord again.

During such a short trip to CVR, I could probably frame the answer to my question regarding the popularity of RKM in the Western world. Physical well-being must be coming routinely every day for most of us. Perhaps, many of us miss the point of mental well-being. Spending days in places like CVR helps us to refresh our body and mind together and teaches us the lesson of being happy by feeling oneness with others. I must mention that it was a very impressive, evercherishing, and memorable trip for us.

আড্রিয়াটিকের তীরে

শুভ্রদীপ মণ্ডল

সময়টা এপ্রিল মাস। ড্রেসডেন শহর সবেমাত্র দীর্ঘ শীতের রাত্রি পেরিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছে। আর অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চেরি ব্লসমের দল বসন্তকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে তার মনভোলানো রঙের পশরা সাজিয়ে। যদিও ইউরোপীয় স্বভাব অনুযায়ী সমুদ্রে যাওয়ার আদর্শ সময় ইউরোপিয়ান সামার আসতে বেশ দেরী তবুও, এই হালকা শীতের আমেজেই আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম আড্রিয়াটিকের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ আঁকাবাঁকা ট্রামলাইনে জড়িয়ে থাকা ক্লান্ত শহর যখন নিস্তব্ধ, সেইরকমই এক ভোরে আমরা প্রথমে পাড়ি দিলাম পোল্যান্ড এর রোটস্বাফ (Wrocław) শহরে। প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার এই ট্রেন সফরে ঘুম ঘুম চোখে বারবার আমরা পরের দিনের প্ল্যানটা ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম। তার সাথে সাথে দ্রষ্টব্য স্থান গুলোর কিছু কিছু ব্লগ পড়তে পড়তে সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেছিল। এরপর রোটস্বাফ এর কোপার্নিকাস এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় দেড়ঘন্টার ফ্লাইট জার্নি করে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রথম গন্তব্য ক্রোয়েশিয়ার জাদার শহরে। সেইদিন কিছুটা সময় হোটেলে রেস্ট নিয়ে আমরা সন্ধ্যেবেলায় বের হলাম জাদার শহরটা ঘুরে দেখার জন্য। সেইদিন হাতে খুব একটা বেশি সময় ছিল না, তাই একটু ঘুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দ্বিতীয় দিনে আমাদের প্ল্যান ছিল প্লিটভিস ন্যাশনাল পার্ক যাওয়ার। সেইমতো জাদার-এর এক স্থানীয় বাসে করে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যে। সময় লাগলো প্রায় দুই ঘন্টা। উনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট এ জায়গা করে নেওয়া প্লিটভিস পার্ক হলো ক্রোয়েশিয়ার বৃহত্তম আর প্রাচীনতম ন্যাশনাল পার্ক। এই পার্কের প্রধান আকর্ষণ হল এর অতিকায় কিছু জলপ্রপাত আর 'Jazero'।

Plitvice, Croatia

ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় এই 'Jazero' শব্দের অর্থ হলো 'হ্রদ'। আমরা পার্কের ভিতরে প্রবেশ করতেই প্রথমেই চোখে পড়ল এই পার্কের বৃহত্তম আর সুন্দরতম জলপ্রপাত 'সস্তাভিসি'। ধাপে ধাপে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে আসা শ্বেত-শুভ্র জলধারা নিচের জলাশয়ে জমা হয়ে গাঢ় সবুজ রং ধারণ করেছে। সারা পার্কের পরিবেশ জুড়ে জলের নীল সবুজ রং আর ঝর্ণার জলে এঁকে যাওয়া রামধনু এক অদ্ভুত রঙিন মায়াময় পরিবেশ তৈরী করেছিল। শহুরে দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তির ছাপ বোধহয় এই জলস্রোতের মাঝে পরে ধুয়ে মুছে যায়। আর শান্ত হ্রদের নিস্তব্ধতাকে আছড়ে ভেঙে ফেলা জলপ্রপাতের শব্দ যেন অবচেতন মনের কোথাও একটা শান্তির ছাপ রেখে যায় বহুদিনের জন্য। জলের উপর তৈরী করা কৃত্রিম আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে চলতে চলতে আমরা আরো কিছু হ্রদ দেখলাম। তারমধ্যে মিলিনো জেজিরো, ভেলিকো জেজিরো, মোলো জেজিরো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এরপর পার্কের মাঝ দিয়ে একটা হ্রদের দুইধারে জলপ্রপাতের মাঝে কিছুক্ষণ বোটিংও করলাম। বেলাশেষে পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম আভা দেখা দিলে প্লিটভিস পর্ব এবারের মতো শেষ করে ফিরে এলাম সকালের সেই বাসস্টপে। সন্ধ্যের বাসে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য স্প্লিট শহরের উদ্দেশ্যে শুরু হলো আমাদের যাত্রা।

Sastavci, Plitvice, Croatia

স্প্লিট শহরে আমাদের বিশেষ কিছু দেখার প্ল্যান ছিল না। শুধু ডুব্রনিক যাওয়ার পথে রাত্রি কাটানোর জন্য স্প্লিট শহরে থাকা। তাই পরের দিন সকাল সকাল আমরা রওনা দিলাম ডুব্রনিক শহরের উদ্দেশ্যে। প্রায় চার ঘন্টার বাস যাত্রা করে আমরা পৌঁছে গেলাম ডুব্রনিক শহরে। তারপর একটা স্থানীয় বাসে পৌঁছালাম সিটিসেন্টারে। সেখানে কাছেই একটা AIRBNB এর ঘর বুক করা ছিল আমাদের। প্রথম দেখাতেই আমার ঘরটা পছন্দ হয়ে যায়। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই প্রথমে একটা বাগান আর সেখানে রং-বেরঙের ফুলের গাছ লাগানো। তবে সবথেকে ভালো লেগেছিলো ঘরের ব্যালকনিটা দেখে। কারণ সেখান থেকে হাতছানি দিচ্ছে দূরের নীল আড্রিয়াটিক। এই ব্যালকনিতে বসেই সমুদ্র দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। এরপর আমরা কিছুক্ষন রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আবার ডুব্রনিক শহরে। তবে আজকের প্ল্যানে ডুব্রনিক নেই। যা আছে তা হল আড্রিয়াটিকের নীলে লুকিয়ে থাকা এক সবুজ দ্বীপ, নাম লোকরুম আইল্যান্ড। ডুব্রনিক-এর ওল্ডটাউন বন্দর থেকে ফেরিতে করে আমরা পৌঁছলাম লোকরুম আইল্যান্ড এর পোর্টক বে-তে। আইল্যান্ডে ঢুকতেই সামনে চোখে পড়ল একটা ময়ূর - সে যেন তার রঙিন পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আমাদেরই স্বাগত জানাল। এই লোকরুম আইল্যান্ডকে 'আইল্যান্ড অফ লাভ'ও বলা হয়ে থাকে। কেন যে বলা হয় তার কারণ আমার জানা নেই। তবে এই আইল্যান্ডের সৌন্দর্য দেখে এহেন নামকরণের তাৎপর্য অনুধাবন করা আমার পক্ষে খুব একটা কষ্টসাধ্য ছিল না। Turquoise রঙের সমুদ্রে ঘেরা এই ছোট্ট আইল্যান্ড জুড়ে ছোটো-বড় বিরল প্রজাতির গাছপালা আর শান্ত স্বচ্ছ কিছু হ্রদ তো রয়েছেই, তার সাথে রয়েছে অনেক বিরল প্রজাতির কচ্ছপ, কালো খরগোশ আর অসংখ্য ময়ূরের দল। সবমিলিয়ে এই লোকরুম আইল্যান্ড যেন আমাদের চেনা ছন্দের পৃথিবী থেকে অনেকটা দূরের অন্য এক জগৎ। এই আইল্যান্ডে এখনো শহুরে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি বলেই হয়তো এখানকার ফ্লোরা আর ফৌনা আজও এতটা পিওর আর প্রিস্টিন।

Lokrum Island, Croatia

এবার চলে আসি পরের দিনের গল্পে। এই দিনটা রাখা ছিল ডুব্রনিক শহরটা হেঁটে দেখার জন্য। ছোট্ট শহরের প্রধান আকর্ষণগুলো পায়ে হাঁটা দূরত্বের মধ্যেই ছিল। এই শহরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। ডুব্রনিকের দেওয়ালে অসংখ্য বুলেট এর চিহ্ন আজও তার স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষত বহন করে নিয়ে চলেছে। তবে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এই ডুব্রনিক শহর ইতিহাস থেকে অনেক দূরে একটা রূপকথাকে কাছ থেকে দেখার মতো ছিল। 'গেম অফ থ্রোন্স' সিরিজের এক রাজ্য 'কিংস ল্যান্ডিং' হল এই ডুব্রনিক শহর। রূপকথা অনুযায়ী যার আকাশে অহরহ উড়তে দেখা যেত সুদৃশ্য অথচ ভয়ঙ্কর ড্রাগনদের। যার সুসজ্জিত অভিজাত বাগানে সম্পন্ন হতো রাজকুমারের বিবাহ। কিংবা যার সমুদ্রপথে দূরদেশ থেকে এসে পৌঁছতো রানী রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে। সেইসব শুটিং স্পট দেখার পাশাপাশি আমরা ঘুরে দেখলাম ফোর্ট লভরিজেনাক, মিনসেটা দুর্গ, সিটি ওয়াল , ডুব্রনিক ক্যাথিড্রাল , পাইল গেট ইত্যাদি। সারা শহর জুড়ে ছিল বড়ো বড়ো অনেকগুলো সুদৃশ্য প্যালেসও।

Dubrovnik city walls, Croatia

তারই মধ্যে দুটি প্যালেস স্পঞ্জা প্যালেস আর রেক্টরস প্যালেস আমরা ঘুরে দেখলাম। সেই দিনের মতো ভ্রমণ পর্ব শেষ হলে আমরা আবার ফিরে এলাম সমুদ্রতীরে। সমুদ্রের মাঝে মাঝে কিছু পাথরের স্তুপ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিজের ঐতিহাসিক আভিজাত্যের জানান দিচ্ছে, আর তারই মাঝে সূর্য তার রক্তিম আভা ছড়িয়ে সেই প্রস্তরস্তূপের আড়ালে অস্তমিত হচ্ছে। এরপর চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেলে টিলার উপর চোখে পড়লো একটা রেস্টুরেন্ট। মোমবাতি আর ফুল দিয়ে সাজানো এই রেস্টুরেন্টটা, সমুদ্রের ধারে এক কৃত্রিম মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই শেষবেলায় এই রেস্টুরেন্টেই ক্রোয়েশিয়ার লাস্ট সাপার শেষ করে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরেরদিন সকালে আরেকটু ডুব্রনিক শহরটাকে ঘুরে ফিরে দেখলাম। তারপর লাঞ্চ করে আবার বাস নিয়ে আড্রিয়াটিকের তীরের আরেকটি দেশ মন্টিনিগ্রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। প্রায় দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টার বাস জার্নি করে আমরা পৌঁছলাম পডগোরিকা শহরে। না, পডগোরিকা শহর বা মন্টিনিগ্রো দেশ দেখার প্ল্যান আমাদের ছিল না। শুধুমাত্র ফেরার ফ্লাইটটা পডগোরিকা শহর থেকে ছিল বলে সেখানে যাওয়া। এই শহর জুড়ে কোনো উত্তেজনা প্রথমে আমাদের ছিল না, কিন্তু যতই বাসে করে এই দেশের ভিতরে যেতে থাকলাম ততই এই পাহাড় আর সমুদ্র ঘেরা ছোট্ট দেশটা আমাদের বিস্মিত করতে থাকলো। বিকেল বেলায় বাস থেকে আড্রিয়াটিকের স্বচ্ছ জলে সোনালী আলোর ছটা দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল। পরের দিন ভোরবেলা আমাদের ফ্লাইট পডগোরিকা এয়ারপোর্ট থেকে। ভোরের মন্টিনিগ্রো দেখে মনে হাচ্ছিল ক্রোয়েশিয়ার পর এই দেশটা না এলে হয়তো আড্রিয়াটিক দেখাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। হয়তো বা অসম্পূর্ণ থেকেও গেল। কিন্তু যেটা দেখা হল না এবার সেটা দেখতেই আবার একদিন ফিরে আসবো। ততদিনের জন্য না হয় থেকে যাক অধীর অপেক্ষা আর একরাশ ইচ্ছে।

Curiosity - Yudhajit Bhattacharjee

MEMORIES....

Binita Sengupta

Is there anything better than going through old photographs???.....
A faint memory suddenly coming alive, an old friend suddenly making you feel so lonely that you yearn to meet her.....connect with her, a ceremony becomes real, you seem to actually start enjoying the moment, a past visit to a place suddenly makes you long to visit there again. Moreover, seeing the transformation in oneself is the biggest admiration, it brings a sweet smile on the lips. Each and every picture brings along memories galore. A few photographs, but your past is just in front of you.

“Memories ...it motivates you to create new ones"

It is a common sight nowadays, to find people clicking pictures at all places, kudos to the smartphones. Be it malls or picnics or even an evening stroll, you find people of all ages posing for pics. Just the other day, during my morning walk, I found an elderly couple posing for some happy pics together. As they were not able to take selfies, I volunteered to take it for them and felt so good to find them posing happily. But after that, I found it strange that they did not even share a smile or talk. Strange was their relationship - they preferred to capture nice moments to help them feel happy later.
Actually, we tend to enjoy the moment and keep it fresh in the mind to go through whenever we like, in order to actually prolong the moment of joy. In good old days, there was a single camera in the family which was kept for special occasions, so the pictures were special and all would come together to get themselves clicked. They were confined to only special moments, all dressed up and happy scenes. Now the smartphones are handy and there is a picture for every moment, be it sad or happy. If you cook a new dish, a pic makes it look special and if you post it in WhatsApp, the dish really becomes special. A guest in your house, a picture is clicked. If you meet a friend in the market, a pic to post in Facebook and it turns out so special. The comments that follow keep you glued to the phone to know who saw your photo and who commented. That becomes a memory. Memories motivate you to create new ones. Really, if you are feeling low, these photographs flood you with so many memories, that you are bound to feel good that you were a part of that.
Going through the albums brings back all memories of childhood days. Our childhood days, when summer holidays were total fun....a visit to Grandma's

place and spending two months there. All our Masis, Mamas and us cousins would come together. We had plans for picnics, watching movies together or spending the whole day under the sun, catching butterflies or fish or playing "pitto", "gulli danda", "kabaddi". The summer holidays used to be real holidays - no studies, full day masti and burning our skin under the summer sun. The bond that developed with my cousins, was too strong that even though now we don't meet often, there is a WhatsApp group to cling to our memories. We not only share our childhood memories and renew that bond, which has now been distanced by time, place and new relationships, responsibilities and many more things, but create a feeling of an extended family and warmth where we can share our problems with each other.

Now summer vacations need so much planning. The tuition classes, the projects for homework, the competition in all fields have narrowed down the time spent with relatives. The digital world has eaten away the beautiful time spent in fields, gossips and other pursuits. Planning a long holiday is impossible nowadays. Now the kids are busy completing their holiday homework in order to improve their grades; Moms are busy with their own timetable; grandparents are left waiting to spend time with their grandchildren. I hardly remember when I last attended a marriage ceremony with all my relatives around. Some or other commitments just crop up suddenly. Though we spend time in going through pics to relive those moments but seem unable to plan for the special time to be together again.

Reminiscences of the past fills us with so much energy - have you thought why? Because even if you are surrounded by your loved ones now, you cherish your childhood friendships, memorable moments, the low stress life, no tuitions, no competitions to overshadow your enjoyments. I wonder how we planned our careers - our planning did not start till we were in class 10 or 11. Now a kid of class 6 is very opinionated about the career he/she will choose and how it should be achieved, what tuition is required..... Good lord! I would still want a childhood like ours for my kids. I may sound selfish, but yes, even I do want the best thing to happen to my kids, the best career, the best university & the best job.....but still in my heart, I want a happy life for them with lots of memories to hang on. So dear, have more memories, they are your stress busters. Live life to the fullest.

Sanghavi Ray - 11 years

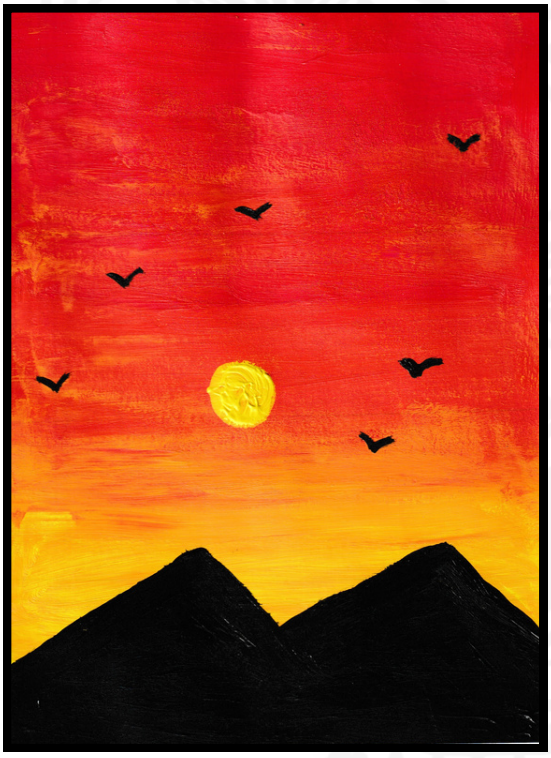

Aarya Syamal - 4 years

Smahi Srivastav - 10 years

The Miracle on the Hudson

Aaryan Kannan

An experience you DON'T want to experience...

This incident happened above and on the waters of New York on the 15th of January. The incident involves an Airbus A320 which belongs to US Airways. On this day it was headed to Charlotte, North Carolina from New York's LaGuardia Airport. The captain was Chelsey "Sully" Sullenberger with first officer Jeffery Skilles who was new to the aircraft. With just 37 hours of experience. Both of the pilots had over 20,000 hours of experience.

Take off and climbing to altitude

The take-off went according to plan and they climbed to 3000 feet when they hit a flock of Canadian geese which were migrating about 4.5 miles from the airport. Almost immediately the General Electric CFM56 engines shut down and they climbed for 19 more seconds. Captain Sully immediately took control from Jeff who did the take off. He immediately switched on the APU and called out MAYDAY reporting calmly that the aircraft had lost thrust on both engines due to bird strikes 22 seconds after the strike. While this was happening, Jeff tried to restart the engines using manual but it was not possible. They initially requested landing back at LaGuardia but Sully realised that it would not work so he spotted Teterboro airport but the plane was way too low.

The Ditching and Rescuing

At this point the only place which was the Hudson river and when Sully was left with no other option he said the famous words "We may end up in the Hudson". Remember the fact that it is mid-January and it was the middle of winter. The water was a chilly 5 °C and water ditching is really dangerous and the procedure for water ditching according to the manual was made for the case only if one engine failed, not both. George Washinton bridge was crossed at the altitude of 900 ft and the plane ditch on 3:31 after roughly 5 minutes of flight. The angle of attack according to the manual was 11° but Sully had an angle of 9.5° before touching the water. The plane crashed in line with the West 50th Street. The impact had a major effect on the tail filling the rear end with water. Keeping this in mind, the flight hostesses evacuated the people onto the wings and front raft which deployed when the front doors were opened. A flight attendant got injured by a compartment lid during impact and passengers had to give first aid to her. A man jumped off and tried to swim towards shore but then changed his mind and came back to the raft. There were ferry boats which immediately came

to the rescue and soon there were the coast guards. The ferry took all the people onboard 24 minutes after the crash and due to the currents boats ended up on both sides of the Hudson, New Jersey and New York. It took 4 hours to count the people and report that all the 150 passengers and 5 crew were alive.

Conclusion

The aircraft was saved from the waters and investigated by the NTSB (National Transportation Safety Board) and then donated to the Carolinas Aviation Museum where it is on display. Captain Sullenberger became an influential face in aviation safety and was offered the job of US ambassador to the International Civil Aviation Organisation (ICAO) but he steps down six months later.

Sources and Images Cited:
Hayward, Justin. "The Miracle On The Hudson - The Full Story." Simple Flying, 15 Apr. 2021, https://simpleflying.com/the-miracle-on-the-hudson/.
https://www.wallpaperflare.com/the-city-the-plane-river-people-new-york-bay-poster-landing-wallpaper-uqrgt

US Airways Flight 1549

নাসিরের মতামত

রাজীব সরকার

লিবিয়া থেকে আগত নাসিরের (নাম বদলানো) সাথে এই নিয়ে অনেকবার কথা হয়ে হলো। জার্মানিতে সে এখনও অবধি প্রায় চার বছর ধরে বসবাস করছে, আর ড্রেসডেনে প্রায় বছর দুয়েক। প্রতি মাসে একবার করে যখন চুল কাটানোর বা তার আংশিক পরিচর্যার প্রয়োজন বোধ করি, তখনই কাছাকাছি একটি মাঝারি খরচ হবে এমন কোনো সেলুনে যাই। এইরকমই কোনো এক সেলুনে নাসিরের সাথে আলাপ। কথা বলতে ওই চুলের আংশিক পরিচর্যার ফাঁকে যেটুকু সময় হয়। তাতেই অনেক খোঁজ খবরও মেলে। সে একভাবে বলে যায় কাজের সাথে। আমি শুধু শুনি, মাঝে মধ্যে কিছু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিই। প্রথম দিনই যখন দেখা হয়, সে বলেছিল আপনি নিশ্চয় ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন। অনুমান করতে পারি বহু দেশের মানুষ সে ঘেঁটেছে। বহু দেশের মানুষের সাথে তার আলাপ পরিচিতি হয়েছে। ড্রেসডেন শহরে বেশ কয়েকবছর আগেও এতো মাঝারি খরচের সেলুন পাওয়া যেতো না। এই ধরণের সেলুনগুলির সুবিধা হল কোনোরকম আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই সেখানে গেলে পরিষেবা পাবার সুযোগ থাকে। একটু গিয়ে বসে থাকতে হয়। তারপরে সারিতে যখন নাম আসে, তখনই পরিষেবা শুরু হয়। সাধারণত যে সমস্ত সেলুন এখানে একটু বেশি খরচের আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখলে সুবিধা, তাহলে আর বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় না। একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে পরিষেবা যেমন শুরু এবং ঠিক তেমনই ঘড়ির কাঁটা ধরে পরিষেবা শেষও হয়। এইরকমও দুই একটা সেলুনে আমি গিয়েছি। কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। আজকাল আর সেখানে যাবার প্রয়োজন বোধ করি না। এই ধরনের সেলুনগুলোতে যাওয়া মানে এতে সময়ের অপচয় হয় না বটে তবে অর্থের কিছু বেশি খরচ হলেও পারে। তাতে যাঁদের আপত্তি নেই সেখানে তাঁরা নিঃসন্দেহে যেতে পারেন। সে কথা আবার ভুলে গেলে চলে না। জার্মান ভাষায় কেশবিন্যাস-কারীকে বলে ফ্রিসেউর। ভালো কেশবিন্যাস-কারী হতে গেলে অবশ্যই ভালো ট্রেনিং-এর ও আবশ্যক। তাও আবার বেশ সময় সাপেক্ষ। এই কর্মপদ্ধতি শিখতে এবং ভালো করে আয়ত্তে আনতে সময় লাগে প্রায় তিন বছর। এই কয়েক বছরে দেখলাম ড্রেসডেনে কয়েকটা সস্তার সেলুন এদিকে ওদিকে গজিয়ে উঠলো। আর সেলুনগুলো যারা চালান তাঁদের একটা অংশ সিরিয়ার থেকে আগত কিছু উদ্বাস্তু। এবং সেখানে কর্মরত অনেকেই আরব দেশগুলো থেকে আগত কিছু মানুষ। একটা জিনিস পরিষ্কার বাইরের দেশ থেকে একটা বয়সের পরে জার্মানিতে এসে নিজেদের বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ নয়। তা সে নিজের পেশা হলেও। জার্মান ভাষা আয়ত্ত করে সমস্ত পেশার স্থানীয়দের সাথে তাল মেলাতে হয়, তাই কাজটি অনেক শক্ত হয়ে ওঠে। এরই সাথে আবার জার্মানিতে একটি পেশা বদলে অন্য পেশাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা মানে একটি অউসবিল্ডুং, অর্থাৎ কিনা লম্বা এক ট্রেনিং –এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এবং সেই ট্রেনিং কখনও তিন থেকে চার বছর ধরে প্রায় চলে। তাই ধৈর্য নিয়ে, যত্ন নিয়ে সেই ট্রেনিং উতরানো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে না। ফলত যা ঘটে অনেক পেশায় বিদেশিদের এখানে প্রতিযোগিতায় আংশিক পিছিয়ে পড়তে হয়। অন্যদিকে আবার, ঠিক গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন, জার্মান শিক্ষা-ব্যবস্থার গুনগত মান যথেষ্টই উন্নত। তাই ভাষার দেওয়াল, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, এদের সময়নিষ্ঠা, কর্মপদ্ধতির নিপুণতা, এরই সাথে একটি নতুন সংস্কৃতিকে মানিয়ে নেওয়া, তালগোল না পাকিয়ে তাদের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে চলা, এইসব অনেকের কাছেই সাফল্য-

এর অন্তরায় হয়ে ওঠে। তাই প্রচুর বিদেশীদের জীবনের লম্বা দৌড়ে শুধু পরিষেবামূলক কর্মপদ্ধতিই শেষে বেছে নিতে হয় জীবিকার জন্যে।অনেককেই আছেন যাঁদের সাথে এইরকম ঘটনা ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হয়ত কারোর শিক্ষা কম্পিউটার বিজ্ঞানে, কিন্তু তাকে বেঁছে নিতে হয়েছে শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষা-দেওয়ার কাজ। স্পেন দেশ থেকে আসা দু-একজনের সাথে জার্মান শিখতে গিয়ে ক্লাসে আলাপ হয়েছে, যারা স্পেন দেশের বাসিন্দা এবং দেশে সেক্রেটারির কাজ করতেন, এখানে এখন তাঁরা রাইনিগুং বা পরিষ্কার করার কাজ করেন জার্মানিতে। কোনো একটি জায়গায় কাজ করার সাথে অউসবিল্ডুং করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে দুটোকে সমান তালে দক্ষতার সাথে চালিয়ে যেতে চাপ এতোই বেশি থাকে। শেষমেশ কাজটি মোটেই আর সহজসাধ্য থাকে না। তাই মাঝপথেই আবার অনেকে ছেড়ে দেন। ১২-১৩ বছর আগে এখানে আমরা অনেকেই চুল কাটাতে যেতাম ভিয়েতনাম থেকে আগত এক ভদ্রমহিলার কাছে। দু এক বছর ওনার কাছে এই পরিষেবা নিয়ে, তারপরে সেই ভদ্রমহিলার কাছে যাওয়া আমরা বন্ধ করতে কিছুটা বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ আমাদের বাসস্থান থেকে সেই ভদ্রমহিলার কর্মস্থল বদলে গিয়েছিল, এবং তার সেই নতুন কর্মস্থল আমার বাসা থেকে বেশ দূরে। ট্রাম, বাস করে যেতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যায়। এরই সাথে আবার যেহেতু তিনি অনেক সস্তায় পরিষেবা দিতেন, তাই সেখানে আমাদের মতন সাধারণ জনতার ভিড় দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। আগে দেখতাম শুধু অভিবাসীদেরই সেখানে ভিড়। তবে আজকাল শুনেছি প্রচুর সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দারও ওখানে যাতায়াত। সস্তায় এতো সুন্দর পরিষেবা-তো কোনো কোনো ইউরোপিয়ানদের মারফত পরিচালিত সেলুনে পাওয়া যাবে না। তাই সুযোগ কেই বা ছাড়ে। এতো জনতার উপচে পরা ভিড়ের জন্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাতে ছুটির দিন নামে শনিবার ওনার কাছে গেলে প্রচুর সময় নষ্ট হত। তাই সেখানে যাওয়া সময়ের সাথে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবুও এখনও সেখানে আমাদের যেতে খুব ইচ্ছা করে, কারণ ভদ্রমহিলা খুব যত্ন নিয়ে আমাদের পরিষেবা দিতেন। এবং খুব সুন্দর করে কথাও বলতেন, খোঁজ খবর নিতেন। অবশেষে সময়ের কাছেই কিছুটা হার স্বীকার করে সেদিকে যাওয়া বন্ধ করতে হল আমাদের।

নাসির রোগাটে ছিপছিপে বছর ২৮ এর যুবক। কালো চুল ছোটো ছোটো করে কাটা। আংশিক কোঁকড়ানোও বলা চলে। চেহারাটি সৌম্য। একনজরে দেখে মনে হয় না রুক্ষ। কিছুক্ষণ কথা বলার পরে সেই ধারনাতে অনেকেরই কিছুটা কাটকুট করতে হলেও হতে পারে। তা অবশ্যই নির্ভর করে কে কিভাবে একটা বাক্যালাপকে গ্রহণ করবে। গত কয়েকমাস ধরে তাঁর মুখটি আমি দেখতে পারছি না। এই করোনাকালে তাঁর মুখ মাস্ক দিয়ে ঢাকা। কিন্তু আগের স্মৃতি অনুযায়ী মনে পড়ে হালকা করে তাঁর দাড়ি থাকতো। সেই দাঁড়ি আবার বেশ সুন্দর করে, পরিপাটি করে কাটা। সে নিজের দেশ লিবিয়া ছেড়েছে বেশ কয়েকবছর হল। এদেশ সেই দেশ ঘুরে আপাতত জার্মানিতে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। কিছুদিন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে, সেখান থেকে জার্মানির হামবুর্গ শহর হয়ে এখন এসেছে ড্রেসডেন শহরে। কিন্তু সে এই দেশে শেষ জীবনকাল অবধি থাকতে চায় না, এখানে সংসারও করতে চায় না। তার মূল কারণ কি, সেই নিয়ে পরে আলোচনা করবো। লিবিয়াতে তার তিন ভাই এবং এক বোন আছে, আর আছে তার বয়স্ক বাবা এবং বয়স্কা মা। তাঁদের প্রতি এখনও তাঁর প্রচুর টান, বেশ মায়া। আর তা থাকাই স্বাভাবিক। এই বৃদ্ধ দশাতে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চায়, তাঁদের সহায় হতে চায় এ তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছা। অনেক কষ্ট করে নাকি তাকে তাঁরা মানুষ করেছেন, বড় করে তুলেছেন। আজ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বড় করে তোলার সেই ঋণ সে শোধ করতে চায়। এই মন্তব্যের বিপরীতে

যদিও কিছু প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। সেই প্রশ্ন কিন্তু দেওয়া এবং নেওয়াকে কেন্দ্র করেই। মানুষ তাঁদের সন্তানদের জন্ম দেয়, লালন পালন করে নিজের ভালোলাগার জায়গা থেকে। একটি জীবকে এই পৃথিবীতে এনে তাকে সঠিকভাবে লালন পালন করা পিতামাতার দায়ভার। তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়ে তাঁর সমস্ত কিছু খেয়াল রাখা, তাকে একটা সুন্দর জীবন দেওয়া দায়িত্ব।

এও আবার কিছু মানুষের জীবনকে খুঁজে পাবার একটি উপায়। সেখানে তার থেকে আগামী-দিনে কি পাওয়া যাবে সেই প্রত্যাশা করাটাই অন্যায় এবং কাম্যও নয়। সেইভাবেই অধিকাংশ মানুষ ভাবে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, সে আর কয়জন ভাবে, আর ভাবলেও সঠিক ভাবে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। একথা আমাদের অনেকেরই অজানা নয় প্রচুর শিশু জন্ম দেওয়া কিছু মানুষের একটা অভ্যাসের মতন। আগামীতে তাঁদের সাহারা হবে সেই প্রেরণাও এর পিছনে অনেকের কাজ করে। শুধুমাত্র অজ্ঞতা এর জন্যে কি দায়ী! তা দিয়ে এর কৈফিয়ত হয়ত দেওয়া যায়, কিন্তু তার যথার্থতা প্রমাণ করা যায় না। শেষমেশ এর জন্যে দায়ী কিন্তু অবশ্যই সমাজ, দায়ী অবশ্যই একটা সিস্টেম। এমন সিস্টেম কেন থাকবে না যেখানে যারা বয়স্ক, তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব নেবে স্টেট, থাকবে তাঁদের সমস্ত দেখাশুনার ভার। শান্তিতে তাঁরা যেন তাঁদের জীবন কাটাতে পারেন। থাকবে তাঁদের নিয়মিত খেয়াল রাখার লোক। তাঁদের যেন কারোর দয়ার পাত্র না হতে হয়। তাঁদের অর্থের প্রাচুর্য থাকুক বা না থাকুক তাঁদের থাকবে নিরাপত্তা, তাঁদের থাকবে নিজেদের মত করে বেঁচে থাকার যথাযথ সুযোগ সুবিধা।

লিবিয়া উত্তর আফ্রিকার একটি দেশ। এর একদিকে আছে মিশর মানে ইজিপ্ট, একদিকে আছে আলজেরিয়া, আছে তিউনিসিয়া, এবং উত্তরে আছে ভূমধ্যসাগর, আর তাকে পেরোলেই ইতালি। বিগত বছরগুলোতে লিবিয়াতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতা হয়েই চলেছে। দেশটি মূলত মরুভূমি এবং প্রচুর তেল সম্পদে ভরা। দেশটির আছে প্রাচুর্যে ভরা অনেক প্রাচীন ইতিহাস। দেশটি বিভিন্ন বিদেশী শক্তির কাছে পরাধীন ছিল কয়েক শতক ধরে। ১৯৫১ সালে লিবিয়া স্বাধীন হয়। স্বাধীন হবার খুব কম সময়ের পরেই দেশে পাওয়া যায় প্রচুর তৈল সম্পদ। আর তা থেকেই খুব তাড়াতাড়ি দেশটি প্রচুর অর্থের মালিকও হয়ে ওঠে। ১৯৫১ সালে দেশ স্বাধীন হলেও রাজতন্ত্রের প্রভাব সেখানে ছিল, এবং রাজার হাতেই অনেক ক্ষমতাও ছিল। তবে ১৯৬৯ সালে কর্নেল গদ্দাফির নেতৃত্বে সেখানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। কর্নেল গদ্দাফির হাতে চলে আসে মূল ক্ষমতা। কর্নেল গদ্দাফি, মানে মুয়াম্মার আল-গদ্দাফি, বহুবছর ধরে লিবিয়াকে চালনা করেছেন। গদ্দাফি তাঁর নিজের মতবাদকে নিজের মতো করে লাগু করারও চেষ্টা করেছেন লিবিয়ার উন্নতির জন্যে। সে ভালো মন্দ যাই হোক। লিবিয়াতে ছিল বহু বছর ধরে একটি স্থির সরকার। স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং ঐক্য এই তিন মূলমন্ত্র নিয়ে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে, গদ্দাফির লিবিয়াতে শাসনকাল শুরু করেছিলেন। গদ্দাফি তাঁর সুদীর্ঘ লিবিয়ার শাসনকালে অনেক ওঠা-নামার সম্মুখীন হয়েছেন। পশ্চিমের সাথে তাঁর আপোষ সেইভাবে কখনই হয়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন নারী এবং পুরুষ সমান। তবে জৈবিক কারণেই নারী এবং পুরুষের সংসারে এবং জীবনে চলার পথে কাজের দায়ভার কিছুটা আলাদা হওয়াই ভালো। সমাজতন্ত্র এবং মুসলিম ধর্ম এই দু-এর সমন্বয়ে সরকার চালনাই ছিল তাঁর আজীবন উদ্দেশ্য। ২০১১ সালে তাঁকে হত্যা করা হয় পশ্চিমের মিলিটারি হস্তক্ষেপের সহায়তায়। এরপরে লিবিয়াতে যে সুখ-শান্তি ফিরে এসেছে তা বলা যায় না। বর্তমানে লিবিয়া এমন একটি দেশ যা অনেকটা কাজ করে একটি স্প্রিং-বোর্ডের মতন। ইউরোপে যে সমস্ত অবৈধ অভিবাসীরা আসতে পছন্দ করেন উন্নত

ভবিষ্যতের আশায়। তাঁরা সেই লিবিয়া হয়ে আসার চেষ্টা করেন। গদ্দাফির হত্যার পরে সম্পূর্ণ লিবিয়াতে কোনো স্থায়ী সরকার এখনও আসে নি। দেশটি সেই কয়েকটি ভাগেই বিভক্ত হয়েই চলছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট সংস্থা বা সরকার এই দেশকে এখন আর পরিচালনা করছে না। অনেকগুলি বিদ্রোহী দল তাঁদের নিজেদের মতন করে শাসনভার নিয়েছেন। লিবিয়া বিভক্ত হয়েছে অনেকগুলি ভাগে। ২০২০ সালেও অনেক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে। একটি দেশে গৃহযুদ্ধ চললে, তার প্রভাব পড়ে শিক্ষাতে, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাতে। দেশ সেইভাবে এগোতে পারে না। সাধারণ মানুষের হয় প্রচুর অসুবিধা। তাও সেইসব অসুবিধার মধ্যেই জীবন এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান স্বচ্ছন্দে প্রবহণ-শীল থাকে না। সমস্ত মানুষের এই বিশ্বে-তো আর অর্থের জোর থাকে না, যে চাইলেই এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাবেন। অর্থের যোগান থাকলেও সেখানে থাকে অন্য অনেক দেওয়াল। মানুষ যেখানে বড় হয়, যেখানে একটু একটু করে তার সমস্ত কিছু গড়ে তোলে, সেখান থেকে এক নিমেষে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে যাওয়া কি সত্যি সবার পক্ষে সম্ভব হয়। না তা হয় না। তাই গৃহযুদ্ধ চললেও তাঁদের জীবন তার মধ্যেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। লিবিয়াতেও সেই একই দশা ঘটেছে এবং ঘটছে। এই সব অস্থিরতার মধ্যে কেই বা সেই দেশে থাকতে চায়। তাই নাসিরের মতন যুবকেরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদেশে, সেই দেশে। আফ্রিকার এইরকম অনেক গৃহযুদ্ধ থেকেই বাঁচার প্রচেষ্টায় বহু যুবক চেষ্টা করছে ইউরোপে চলে আসতে। লিবিয়া হয়ে ইটালি হয়ে আসার প্রচেষ্টা সেখানে আছে। লিবিয়ার অস্থিরতা থেমে গেলে, নাসির আবার তার দেশে ফিরে যেতে চায়। তার বাবা, মা, ভাই বোনের কাছে আবার ফিরে যেতে চায়। জার্মানি তার ভালো লাগে, জার্মানির মানুষদের তার ভালো লাগে। তবে জার্মানিতে সে সংসার করতে চায় না। মূলত কোনো জার্মান আর একটু সীমানাটা বাড়িয়ে দিলে কোনো ইউরোপীয় মহিলার সাথে সে কোনোভাবেই ঘর বাঁধতে চায় না। তার মতে এখানকার মহিলারা বড্ড-বেশি স্বাধীন। স্বাধীনতা ভালো তবে সেই স্বাধীনতা তাঁদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। খুব সামান্য সামান্য কারণে তাঁরা সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্রস্তুত। মতের অমিল হলেই সম্পর্ক ছিন্ন। এখানকার মহিলারা বড্ড-বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নিয়ন্ত্রিত কম হতে চায়। তা নাসিরের একেবারেই ভালো লাগে না। নাসির যেভাবেই দেখুক এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই জার্মানিতে মহিলাদের আত্ম-মর্যাদাবোধ বেশি। মানুষের আত্ম-মর্যাদাবোধ যখন বেশি হয়, এবং মানুষের তৈরি আইন-আদালত যখন সেই আত্ম-মর্যাদাবোধকে সমর্থন করে তখন নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পাবার, নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার, নতুনভাবে পরিচালনা করার চেষ্টাতো মানুষ করবেই। একটাই তো জীবন। তাই কথার অমিল হলে, চিন্তার অমিল হলে, চাওয়া পাওয়ার অমিল হলে, ভালোলাগার অমিল হলে, এই সমস্যা সেই সমস্যা হলে একে অন্যের থেকে দূরে চলে যাওয়া এই দেশে খুবই সাধারণ, খুবই স্বাভাবিক। তাই প্রচুর মানুষ এদেশে কিন্তু একা একাই তাঁদের জীবন চালিয়ে যান। একাকীত্ব মানুষকে এনে দেয় অনেক সমস্যা সেটা যেমন ঠিক, আবার সেই একাকীত্বকে মানুষ যদি একবার মানিয়ে নিতে পারে সেক্ষেত্রে জীবনকে পরিচালনা করা আবার অনেকের ক্ষেত্রেই সহজ হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদের এইসব ঘটনা নিয়ে মানুষ আজকাল বেশি ভাবে না। আর মানুষ দিয়েই তো সমাজ তৈরি, তাই সমাজও এইসব নিয়ে বেশি ভাবে না। কিন্তু আজ থেকে মাত্র ৩০ -৪০ বছর আগেও যত সহজ এখন লাগছে, ঘটনাগুলো কিন্তু এত সহজ ছিলো না। পূর্ব জার্মানির গ্রামের দিকে এতো সহজে সবকিছু কিন্তু সবাই মেনে নিতো না। পূর্ব জার্মানিতে ১৯৯০ আগে সমাজতন্ত্র লাগু ছিল। আর সেখানে নারীদের অধিকার-বোধ সর্বদাই বেশি ছিল। তাসত্ত্বেও কোনো

ভদ্রমহিলা অবিবাহিত মহিলা অথচ মা, অথবা স্বামী-বিহীন মহিলা, খুব চলতি ঘটনা কিন্তু ছিল না। বড় বড় শহরে তা স্বাভাবিক হলেও শহরতলিতে অথবা গ্রামাঞ্চলে চলতি ঘটনা ছিল না। এরিকা ভদ্রমহিলার সাথে প্রথম যখন আমার আলাপ হয়, তাও আজ অনেকবছর হয়ে গেলো। তাঁর বর্তমান বয়স এখন ৮০ এর উপরে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তাঁর জীবনেও ঘটে গিয়েছিলো কিছু অবাক করে দেওয়া ঘটনা। তিনি তখন থাকতেন ড্রেসডেন শহর থেকে কিছুটা দূরে একটি গ্রামে। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের মা। তাঁরাও এখন কয়েকজন ছেলে ও মেয়ের পিতা ও মাতা। তাঁদেরও এখন বেশ বয়েস হয়ে এসেছে। আনুমানিক সেই চল্লিশ বছর আগে এরিকা তাঁর স্বামীকে ছেড়ে আসতে কিছুটা বাধ্যই হয়। তাঁর স্বামীর চরিত্র যে একবারেই ভালো ছিল না। চরিত্র এমনই ছিল যে তাঁর সাথে জীবন কাটানো ছিল দুর্বিষহ। গত শতাব্দীর ৮০ এর দশকে তাঁর সেই পদক্ষেপ কিন্তু মোটেই এতো সহজ ছিল না। এরিকার পিতৃলয়ের তরফ থেকে তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্যে প্রাথমিক স্তরে বাঁধা আসে। এমনকি এরিকাকে এও শুনতে হয় যে, সে যদি একা একা থাকতে চায় তবে, সে যেন সেই গ্রামে না থাকে। যাই হোক তিনি তাঁর ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে শেষে শহরের দিকে চলে আসেন। এরপরে বাকি চল্লিশটি বছর সুখেই আছেন, শান্তিতেই আছেন। অনুমান করা যায় তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলো তিনি ভালোই থাকবেন। প্রথমে তিনি আলাদা হন, এরপরে আইন আদালতের মাধ্যমে তিনি আলাদা হন। নাসির আজ শুধু কাজ করেই খুশি। জীবিকার জন্যে পেটের দায়ে, অর্থ উপার্জনের তাগিদে জার্মানি আজ তাঁর বাসস্থান। নাসিরের কথা থেকে এটা পরিষ্কার জার্মান সমাজে সে একেবারেই ইন্টিগ্রেশনে প্রস্তুত নয়। জানি না আগামী কতো বছর সে জার্মানিতে থাকবে। হয়ত সময়ের সাথে তাঁর বর্তমান ধারণার অনেক পরিবর্তন আসবে। সে শুধুমাত্র জার্মানির একজন উদীয়মান ওয়ার্কিং ক্লাসের সদস্য হিসেবেই থাকবে না। এই সমাজে একটি অংশ হিসেবেই নিজেকে স্থাপিত করবে। অথবা হয়ত সে তাঁর নিজের দেশ লিবিয়াতে আবার ফিরে যাবে। তাঁর বাবা, মা, ভাই বোনের সাথে আবার মিলে যাবে। একসাথে এক খাবার টেবিলে সেমোলিনা (সুজি) দিয়ে তৈরি কুসকোস অতীব আনন্দের সাথে সকলে ভাগ করে নেবে। তৈরি করবে নিজের সংসার। এর উত্তর শুধু আগামী-দিনই দিতে পারে।

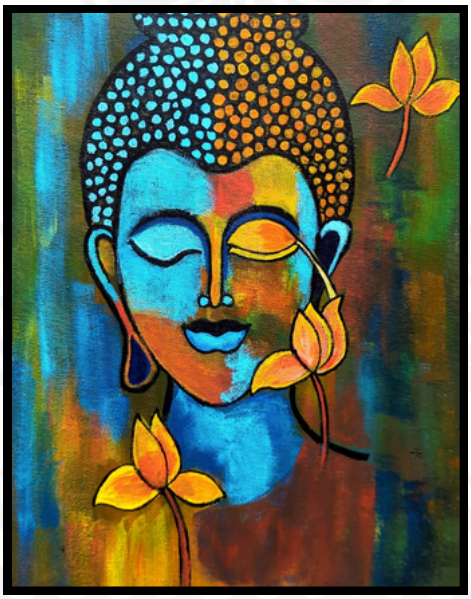

Peace - Moumitha Saha

Avisha Dey - 7 years

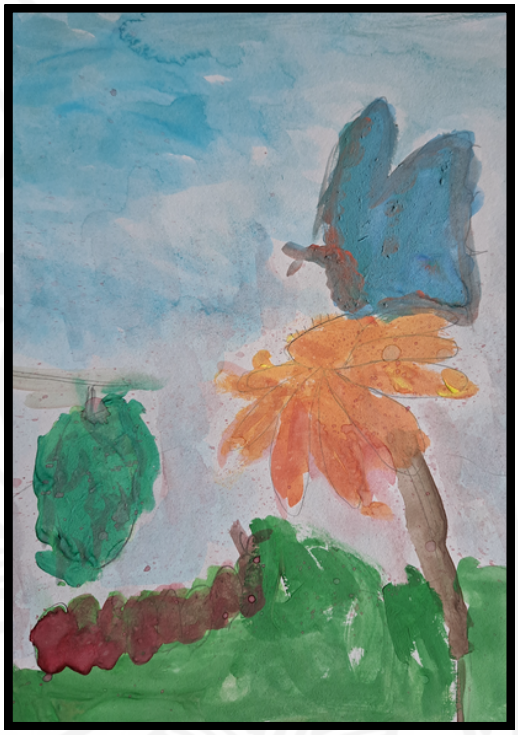

Rayan De - 4 years

Aaratrika Ray - 6 years

Varya - 4 years

বিজ্ঞানের দায় ও বিজ্ঞানীর দায়িত্ব

রাজীব সরকার

সমাজ সংস্কার করা নিয়ে মোটামুটি যেকোনো শুভ-বুদ্ধিমান মানুষই ভাবেন, তা কেউ প্রকটভাবে অথবা কেউ প্রচ্ছন্নভাবে। কিন্তু এইসব ভেবেও এবং তাঁদের নিজেদের মতন প্রচেষ্টা চালিয়েও সমাজ সংস্কার কতোটা করা যেতে পারে বা কতটা হয়েছে তার সহজ কোনো সমীকরণ হয়ত নেই। আমরা বলতেই পারি সমাজ সংস্কারের মূল প্রচেষ্টা আসা উচিৎ শাসকশ্রেণী থেকে, কারণ তাঁদের হাতেই সেই ক্ষমতা আছে যা দিয়ে তাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সংঘবদ্ধভাবে পরিচালিত করতে পারেন, এবং তা পারেন খুব সংগঠিত ভাবে, অনেক নতুন ধারণাকে তাঁরা সঠিকভাবে লাগুও করতে পারেন, কারণ প্রশাসন তাঁদের হাতে, সিস্টেম তাঁদের হাতে, আম-জনতা না চাইলেও তা অনেকটাই তাঁরা মেনে নিতে বা মানিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলেই হয়ত সামগ্রিকভাবে সমাজে তার প্রভাব দেখা যাবে। যেকোনো নতুন নিয়ম যখন লাগু হয়, বা আইন করা হয় তখন সেই আইন সমাজের বৃহত্তর মানুষের কথা ভেবেই করা হয়, অধিকাংশের সুবিধার কথা ভেবেই করা হয়। তা বলে সেইসব আইন চালু করার ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষই যে উপকৃত হবেন এটা ভাবার কোনো কারণ নেই, কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সেই নতুন নিয়ম উপকারে নাও আসতে পারে। পরিবর্তে নতুন ঝামেলাও নিয়ে আসতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সে কাজটি করা হলেও অনেক প্রশ্ন উঠে আসার সম্ভাবনা থাকে। মূলত, সেক্ষেত্রে একটি চাপিয়ে দেওয়া কোনো কাজ বলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মনে হতেই পারে, এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা প্রতিবাদও করে থাকেন। তাঁদের স্বভাব বিরুদ্ধ বা ইচ্ছার বাইরের কোনো কাজ বলে তাঁদের মনে হতেই পারে, এবং তাঁদের মেনে নিতে আপত্তি থাকতেই পারে। এক ধরণের অভ্যাসে তাঁরা তাঁদের জীবনকে সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলেছেন, আরামের ক্ষেত্র করে ফেলেছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে কেই বা চাইবে। আবার একক বা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় সমাজ বদলানোর কাজে ব্রতী যে মানুষ তাঁদের দিকেও তীরের ফলা তাক করা আছে। তাঁরা প্রশ্নের সম্মুখীন হন কি প্রয়োজন আছে তাঁদের সেই প্রচেষ্টা রাখার। একটা বড় অংশের মানুষ ভাবতেই পারেন এইসব দুএকটা ছড়িয়ে, ছিটিয়ে এক অন্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় না রেখে, সামগ্রিকভাবে কিছুই পরিবর্তন করা যেতে পারে না। আমরা সকলেই জানি দুই একটা বই লিখে অথবা কিছু মানুষকে বিক্ষিপ্তভাবে দান-ধ্যান করে আর যাই হোক সমাজের আমূল কিছু পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হতো তাহলে বাংলার উন্নতি অনেকদিন আগেই হতো, অথবা বলা যায় বিশ্বের সাথে বাংলা, বাংলাদেশ তথা ভারত অনেক আগেই পাল্লা দিয়ে বিশ্বে নিজের জায়গা করে নিতো। তা কিন্তু হয়নি। এই যে ভারতের মতন এমন একটি বিশাল জনতার দেশ, সব থেকে বড় গণতন্ত্র স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন দুর্নীতিতে ভুগলো এবং ভুগছে, এর বিরুদ্ধে কি কোনোই প্রতিবাদ হয়নি। না হয়েছে অনেক হয়েছে, বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে হয়েছে, এখনও হয়ে চলেছে। সিনেমা, খবরের কাগজ, নাটক, গান, কবিতা, সাহিত্য, বর্তমানে সমাজ-মাধ্যম, এই সব জায়গাতেই এক বা একাধিক প্রতিবাদের ঝর উঠেছে, সমাজের বিভিন্ন ছবি সেখানে দিনের পর দিন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অসংখ্য ঘটনা নিয়ে হাসি-তামাশা করা হয়েছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সমাজ কতোটা পরিবর্তিত হয়েছে, মানুষের ভাবনার কতটা

পরিবর্তন হয়েছে। সে প্রশ্ন বারে বারে উঠে আসে, এবং আগামী-দিনেও তা উঠে আসবে। একটা কথা পরিষ্কার সময়ের সাথে সমাজের অধিকাংশ বিষয়েরই উন্নতি ঘটে, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হচ্ছে অন্তত কিছু মানুষের, মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে, গড় উচ্চতা বাড়ছে, এসবই সমাজের উন্নতির সবুজ সংকেত। এই সবই সম্ভব হয়েছে ক্রমাগত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সমাজের এই পরিবর্তনে, এগিয়ে বা পিছিয়ে যাবার জন্যে, বিজ্ঞান এবং মৌলিক গবেষণার ভূমিকাগুলো কোথায়, আদেও কি আছে! আর থাকলেও তা কতোটা! সেখানে যারা গভীর বিজ্ঞান গবেষণার সাথে যুক্ত, তাঁদের ভূমিকাগুলো কোথায়! তাঁদের কি কোনো ভূমিকাই নেই। সমাজের প্রতি তাঁদের কি কোনো দায়ভারই নেই! এই প্রশ্নগুলো আমাদের করা উচিৎ এবং সেই নিয়ে যথাযথ আলোচনাও হওয়া আবশ্যক।

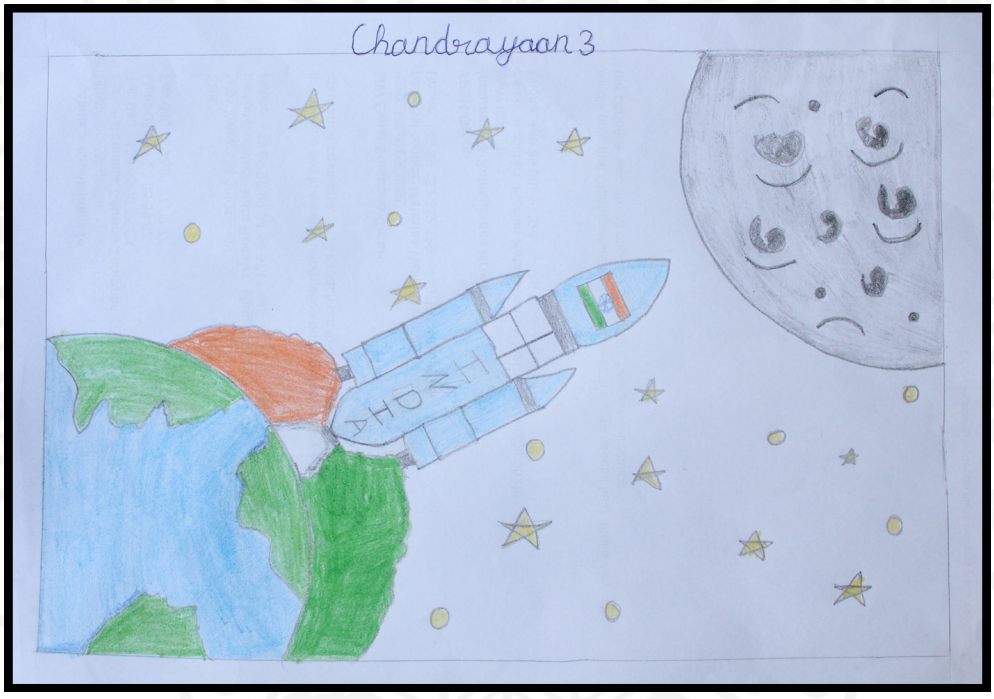

Srinithi Banerjee - 7 years

Smahi Srivastav - 10 years

Aarya Syamal - 4 years

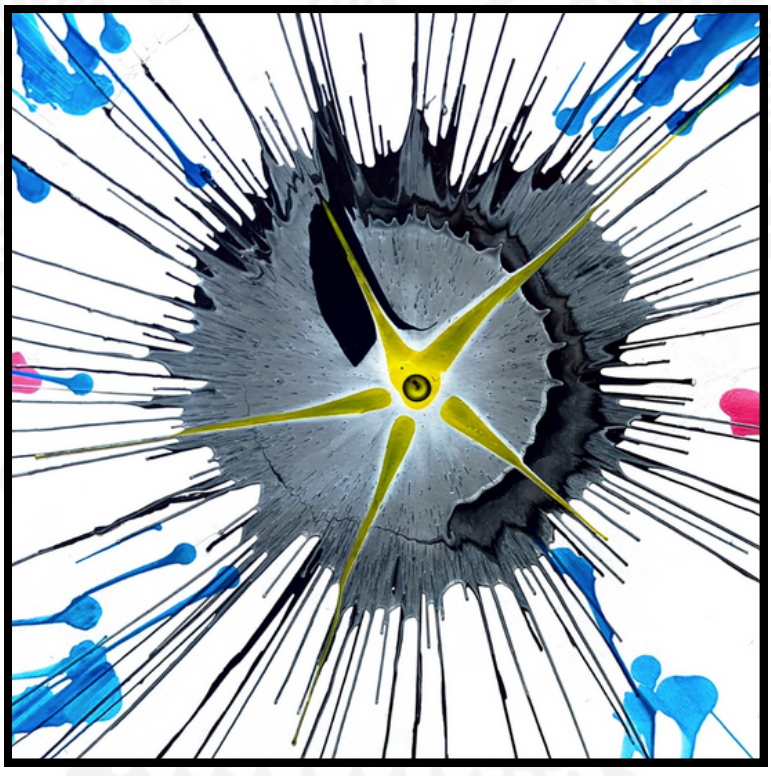

Snigdha Saha - 9 years

হিঙডী রাখো

চৈতালী বর্মন

“গোর্খা রেজিমেন্ট” শুনলেই মনে হয় হয়তো শুধুমাত্র একদল নেপালি যোদ্ধা, আসলে কিন্তু তা নয়। ৮০ শতাংশ যদি নেপালি যোদ্ধারা থাকেন, তাদের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে আরো অন্য জাতের মানুষরাও থাকেন, একথা মিনির জানা ছিল না। মিনির দিদি ও জামাইবাবু থাকেন কালিংপং এ, মিনির জামাইবাবু আর্মির ব্রিগেডিয়ার গোর্খা রেজিমেন্টে। দিদির সাথে মিনির বয়সের পার্থক্য অনেকখানি। এইবার কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশনের ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পর মিনি অনেক কষ্টে মাকে রাজি করিয়ে একাই চলল দিদির বাড়ি। রাত্রি দশটার ট্রেন, সকাল সকাল পৌঁছে যাবে। জীবনে প্রথমবার মিনি একা একা দূর পাল্লার ট্রেনে যাচ্ছে যদিও একই রাজ্যের ভিতরে। মা বাবা দুজনেরই বয়স হয়েছে তাই চিন্তা তো হয় কিন্তু মেয়ের এই আবদার তারা মানতে বাধ্য হলেন।

ট্রেন যথাসময়ে ছাড়লো, দিদি বলে দিয়েছিল ট্রেনে উঠে একটা মেসেজ করে দিয়েই যেন ঘুমিয়ে পড়ে। মিনিও বাধ্য মেয়ের মতো ঘুমিয়ে পড়ল আপার বার্থ এ গিয়ে। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই নিজের সব জিনিস গুছিয়ে নিল। আটটা নাগাদ ট্রেন পৌঁছবে নিউ জলপাইগুড়ি, সেখানে দাদাভাই, মানে মিনির বড় জামাইবাবু আসবেন মিনিকে নিয়ে যেতে। মিনির দিদির যখন বিয়ে হয় মিনি তখন খুব ছোট তাই জামাইবাবুকে দাদাভাই বলেই তার ডাকা। দাদা ভাই কালিংপং এ আসার পর মিনি এই প্রথম সেখানে যাচ্ছে। দিদিয়া কত গল্প করে সেই সব গল্প শুনে শুনে মিনির মোটামুটি কালিম্পং ঘোরা হয়ে গেছে। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছতেই মিনি দেখল দুটি নেপালি ছেলে ট্রেনের ভিতরে উঠে এসে মিনির নাম ধরে ডাকছে। তাড়াতাড়ি তাদের সাহায্য নিয়ে ব্যাগ পত্র নিয়ে নেমে পড়ল মিনি। সাথে তিন তিনটে ব্যাগ, একটা ব্যাগে তো শুধু দাদা ভাইয়ের জন্য সোয়েটার আর মায়ের হাতের তৈরি বিভিন্ন খাবার। দাদাভাই মায়ের হাতের তৈরি সোয়েটার ও মাফলার পরেই গত ৩০ বছর চালিয়ে দিল।

স্টেশনে নেমেই দেখলো দূরে দাদাভাই দাঁড়িয়ে ,তেমনি সুপুরুষ যেমনটি আগে তিনি ছিলেন। ৬ ফুটের কাছাকাছি লম্বা ছিপ ছিপে চেহারা তার সাথে চওড়া গোঁফ, দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি আর্মিতে আছেন। দু'বছর হল দাদাভাই কালিম্পং এ এসেছে তার আগে দাদা ভাইয়ের দৌলতে কত জায়গা যে ঘুরেছে মিনি। এই সমস্ত জায়গার মধ্যে মিনির সবথেকে ভালো লেগেছিল কাশ্মীর। যাক শেষমেষ গাড়িতে বসে গল্প করতে করতে আর সবুজ পাহাড়ের ফাঁকফোকর আর চা বাগানের প্রতিসাম্য দেখতে দেখতে কালিংপং পৌঁছানো হলো। গাছপালা দিয়ে ঢাকা অপূর্ব সুন্দর বাংলো বাড়ি, গেট থেকে বেশ খানিকটা নিচের দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে হলো। কত রকমের গাছ, ফুল আর তার সাথে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ও পাখিদের কোলাহল। দিদিয়া ভিতর থেকে ছুটে এলো ,এসে বুকে জড়িয়ে ধরে কত আদর, প্রায় দু বছর পর দিদিয়ার সাথে মিনির দেখা ।এরপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে মিনি একটু বাড়িটা আর বাগানটা ঘুরতে বেরোলো ।এমন সুন্দর জায়গা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এখন মিনি বুঝতে পারল কেন দিদিয়া আর দাদা ভাই কলকাতার ওই কোলাহলের মধ্যে আর ফিরে যেতে চায় না। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে দূরে মিনি নিজের খুব পরিচিত একজন মানুষকে দেখতে

পেল। ওর নাম সাবি। নেপালি তে সাবি মানে মিষ্টি মেয়ে ,দু'বছর আগেও সাবি র সাথে দেখা হয়েছিল মিনির। ছোটখাটো চেহারা, সুঠাম শরীর, তামাটে গায়ের রং আর খুব মিষ্টি মুখ সাবির,। সাবির বয়েস বছর ৩৫, বহু বছর দিদির সাথে আছে, বাগান করতে ভারি ভালোবাসে, সাবির হাতের কত রকমের নেপালি খাবার খেয়েছে মিনি। এক কথায় মিনি সাবির খুব প্রিয় মানুষ আর তেমনটাই প্রিয় হল সাবি মিনির কাছে। কিন্তু এবারে সাবি যেন কেমন অন্যরকম, দূর থেকে মিনি বেশ কয়েকবার সাবিকে ডাকলো কিন্তু সাবি কোন সাড়া দিল না। সাবির সেই আগের মতন আর সাজ নেই, কেমন যেন অন্যমনস্ক আর কি যেন বিড়বিড় করে বলে চলেছে। ভালো করে কান পেতে শুনলে বোঝা গেল সে বলে চলেছে "হিঙডী রাখো, হিঙডী রাখো"। মিনি আবারও সাবির নাম ধরে ডাকলো কিন্তু সে যেন শুনতেই পেল না। মিনি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দিদিয়া কে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাগানে কি সাবি কাজ করছে?" দিদির মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল,। মিনি দিদিকে আবার জিজ্ঞেস করতে দিদি জানালো সাবির শরীর ভালো না, গত দুবছর সে ভালো করে খায় না ঘুমায় না শুধু সকাল হলেই বাগানে গিয়ে বসে থাকে। অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে, সবই মোটামুটি করা হয়েছে কিন্তু সাবির কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু কেন এমনটা হলো? দিদি আগে তো কখনো এসব জানায়নি মিনিকে। সাবির স্বামী গোর্খা রাইফেলসের জওয়ান ছিলেন, কিন্তু কিছু বছর আগে তিনি শহীদ হয়েছেন সেই থেকে সাবি ও তার ছেলে নিম দিদির কাছেই থাকে। ছোটবেলায় মিনি যখনি এসেছে নিম ছিল তার খেলার সাথী। নিম খুব দুঃসাহসিক একজন ছেলে, বয়সে মিমির থেকে বছর দেড়েকের ছোট সে। মিনির মনে আছে একবার দাদাভাই যখন কাশ্মীরে পোস্টেড মিনির মনে আছে নিম এর সাথে খেলতে গিয়ে বরফে তার পা আটকে গিয়েছিল নিম তখন স্টিলের গ্লাস দিয়ে বরফ কেটেছিল। নিম খুব দুঃসাহসিক একজন ছেলে, বয়সে মিমির থেকে বছর দেড়েকের ছোট সে। কতদিন বিকেল বেলায় মিনি আর নিম সাবির কাছে বায়না ধরেছে মোমো আর থুকপা খাবে বলে, সাবির হাতের সেই মোমো আর থুকপার স্বাদ যেন ভোলা যায় না। দু বছর আগে নিম ও গোর্খা রাইফেলস এ যোগ দিয়েছে, এ কথা শুনেছিল মিনি। দিদিয়াকে নিমের কথা জিজ্ঞেস করতে দিদি কেমন চুপ করে গেল ,কিছুই বলল না। হঠাৎ মিনি দেখল সাবি রান্নাঘরের পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে এল, মুখে সেই একই কথা "হিঙডী রাখো, হিঙডী রাখো"। সাবিকে সামনে থেকে দেখে মনে হল সে এখানে আছে ঠিকই কিন্তু তার মন এখানে নেই, মিনি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে ভাবল একটু বাজারে ঘুরে আসা যাক। তাহলে জায়গাটা একটু চেনা যাবে বাড়ির সবাই যেন কেমন চুপচাপ হয়ে আছে।

বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মিনি ,সাবি আর নিমের কথা ভাবতে লাগলো। নিমের কথা শুনে দিদির মুখটা কেন অত দুঃখী হয়ে গেল?। দিদি কি যেন তাকে বলল না, লুকিয়ে গেল।যাক, বাজার ঘুরে বাড়ি ফিরে গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে মিনি দেখল বাড়িতে বেশ ভিড়। আর্মির ইউনিফর্ম পড়া কজন বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আছে; বুকের ভিতরটা কেমন যেন হিম হয়ে গেল। গেট থেকে ঢালান দালান পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে ভিতরে গিয়ে দেখল দাদাভাই চেয়ারে বসে ফোনে কথা বলছে। দিদিয়া মাটিতে, আর সাবি দিদিয়া র কোলে মাথা রেখে। সাবি সমানে বলে চলেছে "হিঙডী রাখো ,হিঙডী রাখো"। মিনি কিছুই বুঝতে পারল না, কিন্তু আস্তে আস্তে সাবির পাশে গিয়ে বসে গায়ে হাত দিতেই সাবি মিনিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল; এ কান্না যেমন তেমন কান্না নয় বুকের ভিতর থেকে একটা চরম কষ্ট যেন কান্না হয়ে সাবির দুচোখ বেয়ে নেমে আসছে। দিদির দিকে তাকাতে দিদি বলল ,"আজ

একটু আগে ফোন এসেছে নিমকে পাওয়া গেছে।“ নিম দু'বছর আগে কারগিলের যুদ্ধে গিয়েছিল তার প্রথম ডিউটি করতে। কিন্তু প্রথমবার বাড়ি থেকে যাবার পর সে আর ফিরে আসেনি। সবাই বলেছিল নিম শহীদ হয়েছে কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গত দুবছর সাবি প্রতিটা দিন নিম এর জন্য শুধু অপেক্ষা করেছে আর বলেছে “হিঙডী রাখো, হিঙডী রাখো “মানে চলতে থাকো একদিন নিম ঠিক ফিরে আসবে। আজ দু বছর পর নিমের বরফে ঢাকা শরীর পাওয়া গিয়েছে। কমান্ডিং অফিসার ছবি তুলে পাঠিয়েছেন, মাইনাস ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ বরফের নিচে থাকা নিমের শরীর একেবারে জীবন্ত মানুষের মত। কমান্ডিং অফিসার ছবি তুলে পাঠিয়েছে, আজ নিম ফিরল ঠিকই কিন্তু সে আমা বলে ডাকলো না। সাবিকে ছোটবেলা থেকে নিম আমা বলে ডাকতো। মিনির মনে হল ভগবান মানুষকে এত কষ্ট কেন দেন ?একটা মানুষকে এত কষ্ট দেওয়া কি ঠিক সব মানুষের সহ্য ক্ষমতার একটা সীমা থাকে। সাবিকে দেখে মনে হল সেই সব সীমা সে অতিক্রম করেছে। সেই রাতটা কাটল কেমন যেন শব্দহীন ভাবে। সকালবেলা সাবিকে দেখা গেল রান্নাঘরে ,মোমো আর থুকপা বানাচ্ছে। দিদিয়া বললো আজ দু বছর পর সাবি মিনির জন্য সকালের ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে। আজ সকাল থেকে সে আর বলেনি “হিঙডী রাখো”। সময় সাবিকে শিখিয়ে দিল জীবন কখনো থেমে থাকে না সে শুধুই চলতে থাকে।

অবনী বাড়ি আছো? - Tanmoy Sarkar

A Trip to Rügen

Sanghavi Ray

On a warm summer day, specifically on the 20th of July, my family and I were fully prepared for our upcoming adventure. We had two suitcases with us, one of which was so big that I could have easily curled up inside of it. Our destination was none other than RÜGEN, a beautiful island situated in the Baltic Sea. To get there, we had to take a one-hour train ride from the state of Mecklenburg-Vorpommern. We were all excited to explore the island's sandy beaches, majestic cliffs, and lush forests.

The journey began early in the morning as we boarded the train at exactly 6:00 AM. The first leg of our trip was only 2 hours long and we arrived in Berlin for a brief layover. After the short break, we boarded the next train for the second leg of the journey which lasted 4 hours. In total, our journey took 6 hours, and we had the opportunity to take in the sights and sounds of the beautiful surroundings along the way.

On the first day of our vacation, I was filled with excitement to finally visit the beach. It was a mere 5-minute walk from our hotel, so we didn't waste any time getting there. The chilly weather and water didn't deter me from taking a plunge into the ocean. As we strolled along the shore, we started building sand castles using the dry sand. It was a fun-filled day spent enjoying the beautiful scenery and making precious memories.

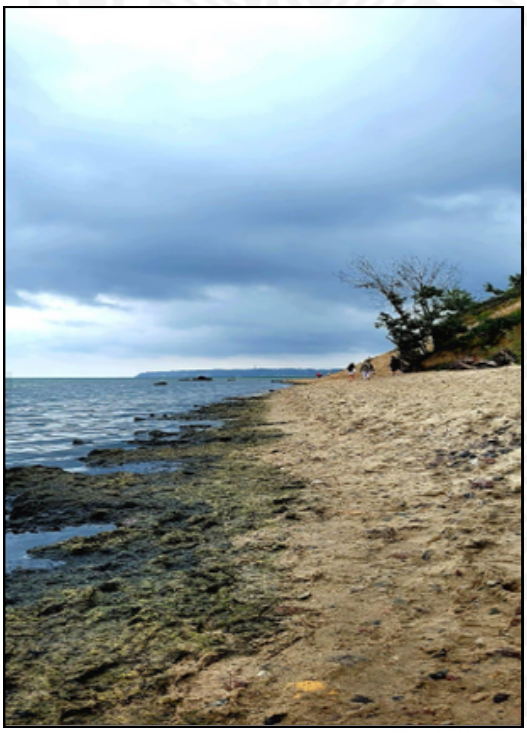

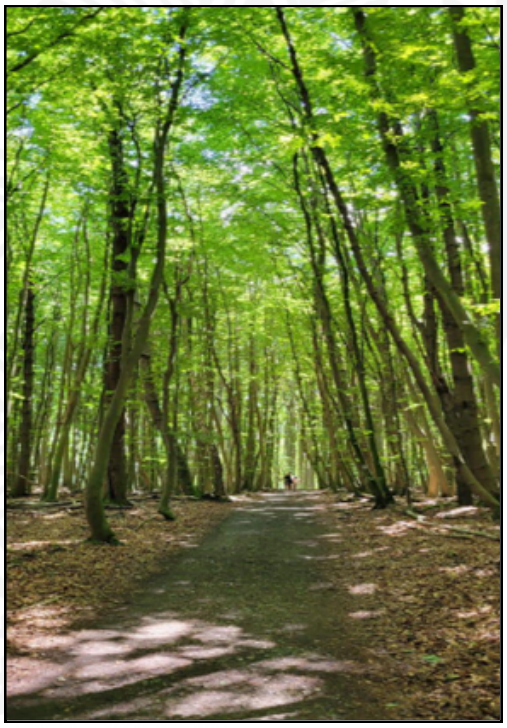

Sights and sounds of Rügen

On the second day of our trip, we set out on a 10km trek through the breathtaking Jasmund National Park. Despite feeling exhausted and weary, we continued on, eager to uncover the hidden beauty that awaited us. The trail was marked with intricate patterns on the trees, which I initially dismissed as mere paintings. However, as we trekked further along the path, I began to realize that these markings were actually trail markers leading us to our destination.
Finally, after what seemed like an eternity, we arrived at the top of a hill and were met with a stunning view of the Baltic Sea. The crystal clear waters sparkled in the sunlight, while the cool breeze gently caressed our faces. The view was absolutely worth the long and tiring journey it took to get there.

The third day of our vacation was blessed with bright sunshine, which made us eager to go swimming at the beach. As we arrived, my eyes were drawn to the shimmering blue water that lay before us. The beach had a unique charm, it looked like a swimming pool, but the sand underneath made it feel more natural. In the water, I noticed small fish swimming around me. I was determined to catch them with my bucket, but they were too quick for me. As I ventured further into the water, the depth was increasing rapidly. The water was only up to my waist when I first stepped in, but as I moved a little further, it reached up to my knees. My mother accompanied me as I went in deeper because I was scared. Suddenly, we spotted some jellyfish swimming in the water. I let out a loud squeak of fear. But my mother calmed me down, saying that they were not harmful. Unfortunately, my dad couldn't join us because he was suffering from a cold. After a while, we convinced my six-year-old sister to come into the water with us. As she touched a sea plant, she quickly changed her mind and refused to go back in. As the day progressed, we went out to explore some of the stunning views around the area. Finally, we treated ourselves to some delicious ice cream. It was a perfect day!

The fourth day of my trip was truly special as it also marked my birthday on the 23rd of July. The morning was rainy, but it did not dampen my spirits as I was eagerly looking forward to the day's events. I indulged in my favourite flavoured chocolate cake which was incredibly delicious, and it made my taste buds dance with joy!

Later, we visited a hunting palace where I saw animals such as reindeer and other animals that were hunted at the time, I was fascinated by their magnificent horns and skin. It was a unique experience that left me in awe. To celebrate the occasion, we decided to buy another ice cream, and the cold treat was refreshing and satisfying.

Birthday cake!

Hunting Lodge

On our way back, we rode an old train that was powered by burning coal, and it was an unforgettable experience that gave us a glimpse of the past. Feeling hungry, I craved some Vietnamese food, and we went to a restaurant that served authentic cuisine. The food was simply mouth-watering and bursting with flavours that delighted my taste buds.

The last day at the beach was bittersweet for me as I have a deep love for the ocean. We decided to visit a nearby beach that had big waves, which was a stark contrast to the calm waters of the other beach where we went swimming. My sister and I frolicked along the shore, chasing and running from the waves, while a swing nearby added to the fun. My parents went on a walk to see some pirate-like ships and returned with stories to tell. As the time came to leave, I felt a deep sadness, knowing that I had to say goodbye to this beautiful place. We boarded the train at 4:00, and as we journeyed back, my parents promised that we would return to this island paradise again.

অন্ত্যমিল

সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

খাতার পাতায় অনেক অংক করা।
কলম ভেঙে হিসেব-নিকেশ,
এদিক-ওদিক জবরদখল,
দাখিল হলো হিসেব ভুলে ভরা।

জল পড়েছে কচুপাতার কোণে।
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি হলো,
জল ভরেছে গর্তগুলো,
দুললো পাতা অমোঘ উচাটনে।

কর গুনেছি শেষ বিকেলে বসে।
দুহাত দিয়ে আসন পাতি,
আঁজলা জল ছিটিয়ে রাখি,
পুকুরজলে রোদ ডুবলো শেষে।

খাতার ওপর মলাট দিয়ে রাখি।
সাত-সতেরো অনেক পুরাণ,
দিনের শেষের তীব্র বয়ান,
সরিয়ে, সাদা কাগজ খুঁজতে থাকি।

শৌখিন কবি

পাপিয়া দাস

আমি এক শৌখিন কবি,
ছুটির দিনে কবির কবিতা মেখে
স্বপ্নের জাল বুনি।

সকালে প্রাতঃরাশ শেষে ,
অমি "রবীন্দ্রনাথে" গলা সাধি।
বেলা গড়ালে আর এক কাপ চা হাতে,
" সুকান্তে" বাসা বাঁধি।

মধ্যাহ্নে মন আমার
বিদ্রোহী হয়ে "নজরুলে" আছড়ে পড়ে ।
রক্তে তখন শুধুই কবি
আর তাদের কবিতারা আনাগোনা করে ।

সাঁঝের বেলা সন্ধ্যা যখন নামে,
"জীবনানন্দ" বেশে
মন আমার নকশী কাঁথায় টানে ।

নিঝুম রাতে তন্দ্রা জড়ানো চোখে ,
মন আমার "শক্তি" তে মিলে মিশে
হঠাৎ যেন,
অবনী'র কড়া নাড়ার শব্দ
স্বপ্নে ওঠে ভেসে।

Let me share....

Prantik Mahajan

Let me share a short anecdote here. We were returning to Dresden. It was late in the night and the train had just left the BER Airport. Suddenly, someone fell ill and there was an announcement for help from doctors (if any), accidentally travelling on-board. Immediately, some people responded and together with the on-board staff, emergency first-aid was provided. It was probably a case of epilepsy and the affected person was struggling on the floor. In a few minutes, the train made an emergency stop at the nearest station (not a scheduled stop) and emergency services promptly arrived with all medical support. They first revived the patient and then took the affected person to the nearest hospital. Everyone waited patiently in the train until things were in order and finally the train departed again towards its destination.

Moral of the story - life is precious and matters most in any given situation.

স্পর্শ

দেবযানী গুহ বসু

দুচোখ মেলে দেখি শুধু সবুজ ঘন সবুজ
আকাশী নীল যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে
পেঁজা পেঁজা সাদা মেঘ দূরে মুচকি হাসে
রোদের কিরণ ছুঁয়ে যায় বড্ড ভালোবেসে
রাত্রিকে সে ভয় পায়না
আলোর বুকে মাথা নত
নরম গালের স্পর্শে জোছনা শিহরিত ।।

একটা গল্প হোক

দেবযানী গুহ বসু

ভাবছি তোমায় নিয়ে গল্পো হোক
দু চার পা একসঙ্গে হাঁটা হোক
ওই ঘাসফুল আর মৌমাছির প্রেম হোক
আচমকা বৃষ্টিস্নানে ভেজা কামনা হোক
নরম রোদ আর তপ্ত রোদের মিতালী হোক
চুপিসারে অব্যক্ত অনেক কথা হোক
তোমার আমার অনামী এক গল্পো হোক
অন্তিমকালে ঠিক সেই গল্পই মনে হোক।

ভূতের সেকাল - একাল

কমল সামুই

“কেউ বলে সত্যি তো, কেউ বলে মিথ্যে ,
ভূত কোথা? ভূত নেই -ভয় শুধু চিত্তে ।
কেউ বলে, ওরে বাবা, ভূত ছিল সেকালে,
রং ঢং বদলিয়ে, খাসা আছে একালে।”

অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন ছাত্র । শহরের হোস্টেলে থাকি। বাবার জরুরী চিঠি পেয়ে গ্রামের বাড়ি আসার জন্য শেষ বাস ধরি। বাস যখন গ্রামে পৌঁছালো তখন বেশ রাত আর গ্রামে সন্ধ্যা হলেই তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাস স্ট্যান্ড থেকে আমাদের বাড়ি বেশ খানিকটা হাঁটা পথ। বাস থেকে যে দু একজন যাত্রী নেমে ছিল তারা যে যার গন্তব্যে চলে গিয়েছে - আমিও হাঁটা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পরে খেয়াল হল আজ অমাবস্যা। বাঁশ বাগানের পাশ দিয়ে যে রাস্তা সেখানে পা বাড়াতেই দেখি দু জোড়া চোখ আগুনের মত জ্বলছে আর মাঝে মাঝে দুলেও উঠছে, তার সঙ্গে বিচিত্র আওয়াজ। তখন জোরে জোরে রাম নাম করতে করতে দে – দৌড়, এক ছুটে বাড়ির দরজা। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম অমাবস্যার দিন আর রওনা হব না। তাতেই কি রেহাই আছে? এক জ্যোৎস্না রাতে গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছি তখন দেখি দূরে সাদা থান পরে মাথা দোলাতে দোলাতে কে যেন আমাকে ডাকছে। এই আছে তো এই নেই। আবার ভরসা সেই রাম নাম। অনেকদিন হয়ে গেলো গ্রামের বাড়িতে বসবাসের পাট প্রায় চুকিয়ে দিয়েছি। এখন শহরে থাকি। এখানেও কি নিস্তার আছে? কলকাতা শহরে এখনও অনেক বাড়ি আছে যেখানে ভূতেদের আস্তানা, আর তাদের নিয়মিত দর্শন ও পাওয়া যায়। অনেকে নাকি নিজের চোখে দেখেছেন। আমি এখনও তেনাদের দেখা পাইনি - তবে যারা নিয়মিত ট্রেনে ভ্রমণ করেন তারা যে বিভিন্ন স্টেশনে ভূত দেখেছেন, তাদের সূত্র ধরেই আপনাদের জানাই ভারতবর্ষে কোন কোন রেল স্টেশনে তেনাদের দেখা আপনি পাবেনই। তবে জানেন তো ওনারা আবার রাত্রি ছাড়া দেখা দেন না তাই ভ্রমণ টা করতে হবে রাত্রে এই আর কি! তাহলে ব্যাগ পত্তর গুছিয়ে নিয়ে ঠিক করে ফেলুন কোথায় কোথায় আপনি যেতে চান ।

১) বারোগ স্টেশন , সিমলা । ইংরেজ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার এর অতৃপ্ত আত্মা এই স্টেশন এবং প্ল্যাটফর্মের চার পাশে এখনও ঘুরে বেড়ান। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কেউ কানের কাছে ফিসফিস করে “Hello” বলে উঠলে ঘাবড়ে যাবেন না।

২) লুধিয়ানা রেলওয়ে স্টেশন, পাঞ্জাব। - যেই আপনি সিমলার পাহাড় থেকে পাঞ্জাবে আসলেন আর পা দিলেন লুধিয়ানা রেল স্টেশনে, আপনি রিজার্ভেশন সেন্টার অফিসের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পারেন সুভাষ নামে এক কম্পিউটার অফিসার কে যে কিনা নিজের কাজ কে খুব ভালোবাসত। ২০০৪ সালে আত্মহত্যা করলেও অফিসের মায়া এখনও ত্যাগ করতে পারেনি।

৩) এম জি রোড মেট্রো স্টেশন, গুরগাঁও। এক মহিলাকে প্রায়শই এই স্টেশন এ এবং প্ল্যাটফর্মের আশে পাশে বিড়বিড় করতে দেখা যায় যিনি বহুদিন আগে এই স্টেশনে আত্মহত্যা করেছিলেন।

৪) দ্বারকা সেক্টর ৯ মেট্রো স্টেশন, দিল্লী। এই মেট্রো স্টেশনের প্লাটফর্মে কোন সাদা পোশাকের মহিলা আপনাকে যদি থাপ্পর মারেন, ঘাবড়ে যাবেন না। ওই মহিলা আবার ট্রেন কে তাড়া ও করেন। কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ুন কারণ কাউকে বলতে পারবেন না যে আপনি ভূতের থাপ্পড় খেয়েছেন।

৫) মুলুন্ড রেলওয়ে স্টেশন, মুম্বাই। আপনি তো দিল্লী থেকে মুম্বাই এসে গেলেন। তাতেও কি রেহাই আছে! এই স্টেশনে প্রায়শই সন্ধ্যার সময় চিৎকার এবং কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই স্টেশনের আশে পাশে যতজন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সবাই স্টেশনে এসে বাসা বেঁধেছে বলে খবর।

৬) বেগুনকোদার স্টেশন, পুরুলিয়া। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এক মহিলা ট্রেনের পিছু পিছু ছুটে চলেছেন। দীর্ঘদিন এই স্টেশনে কোন ট্রেন থামতো না। ৪২ বছর পর ট্রেন থামা শুরু হলেও সন্ধ্যের পর কোন ট্রেন দাঁড়ায় না, কোন ও যাত্রী স্টেশন মুখো ও হয়না।

৭) রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন । ভূতেদের কনফারেন্স এর জায়গা হচ্ছে এই মেট্রো স্টেশন। কলকাতা মেট্রোতে যত মানুষ ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান তারা প্রত্যেকে জড়ো হন এই রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে । অনেকেই দেখেছে তেনাদের একসঙ্গে বসে মুড়ি চানাচুর চিবোতে চিবোতে মিটিং করতে। তেনাদের এই মিটিং এ যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য মেট্রো কতৃপক্ষ রাতের শেষ মেট্রো টি এই স্টেশনে থামান না।

আরও অনেক জায়গাতেই তেনাদের দেখা পেতে পারেন কারণ ভূতেরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে খুব চিন্তিত, তেনাদের জায়গা মানুষ দখল করে নিচ্ছে। তাই ভবিষ্যতের ভূত দের ঠিকানা যে এই সব ঝাঁ চক চকে জায়গাতেই হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

"Immersed in Nature's Palette: Captivating view of the picturesque Grindelwald nestled amidst the Swiss mountains, adorned with vibrant green landscapes." - Binit Syamal

My Europe Tour Story

Abhinay Sawant

In the heart of our childhood, we forged bonds that time and distance could never break. We grew up together, sharing the same neighborhood, the same building, and even the same classrooms. But as life would have it, destiny scattered us across the globe, with some of us pursuing higher education and careers in London and Germany. The years passed, and we found ourselves separated by oceans, yearning for the days of our shared adventures.

The idea of a grand European reunion had been simmering since 2015, but it seemed elusive. Financial constraints, weddings, and the complexity of adult life had kept us from realizing this dream. Then, in 2019, fate smiled upon us, and a small get-together sparked the flames of our long-awaited European adventure.

With determination and excitement, we embarked on our journey on September 10, 2019 (We were 9 guys - 6 from India Mumbai, 1-UK, 1- Frankfurt, 1- Berlin), leaving behind the familiar streets of India for the enchanting landscapes of Europe. A friend greeted us at Frankfurt Airport, where the aroma of a homemade chicken dish welcomed our eager palates.

Over the next 18 to 20 days, we crisscrossed the continent, exploring the rich tapestry of cultures, traditions, and cuisines that Europe had to offer. The joy of reuniting with lifelong friends and experiencing the dream we had nurtured for years was nothing short of magical.

We decided to seize the moment and embrace adventure to the fullest. From heart-pounding skydiving experiences to thrilling adventure games, serene underwater walks to scenic train journeys and unforgettable road trips, we sought new thrills and unforgettable memories.

Destination we have visited: Frankfurt, Prague, Budapest, Munich, Switzerland, Amsterdam, Berlin, Paris, Italy, Rome, Austria, France.

Our journey wasn't without its hiccups – a friend's forgotten bag with foreign currency, another's lost camera, and an unfortunate theft. Yet, these setbacks only added to the tapestry of our adventure. We immersed ourselves in local shopping, sampled exotic dishes, and even took on the role of breakfast chefs in our Airbnb rooms. Through it all, we cherished the camaraderie and the simple joys of being together.

As the days passed, September 28, 2019, marked the bittersweet end of our European odyssey. We returned to our daily routines in India, but our hearts brimmed with memories that would be recounted for generations to come.

Our European journey was more than a mere tour; it was a chapter in our lives that defined friendship, adventure, and the indomitable spirit of exploring the world with those who matter most.

একটি রাতের ইতিকথা

ইনজামামউল আরিফ

"You Spirit of Holiness, you live in our unholiness. You Spirit of Wisdom, you live in our unwisdom. You Spirit of Truth, you live in our untruth. Oh, please stay there! You have every right to go looking for a more desirable address, but you do not do so. After all, it would be a futile search! You, who are creating and regenerating and making your own house, oh, keep on living here so that some day you may be pleased with the house you are making in my unworthy heart." - Kierkegaard

রাত আমার বড় প্রিয় । একটি রাত একটিমাত্রই স্বপ্নের জন্ম দিতে পারে । রাতের রঙ সাধারণত কালো, ক্ষেত্রবিশেষে তা নিয়নমাখা, তেলচিটে ক্যানভাসে এলোমেলো রঙের ঝড় । কয়েকটা নেড়ি কুত্তা ছাড়া চরাচর আজ রাতের মায়ায় আবিষ্ট । এমন রাতে ভালোবাসতে ইচ্ছে করেনা ? আঠালো রঙ, ওই তেলচিটে ক্যানভাসে লেপে দিতে আমার তো ভারী ইচ্ছে হয় । নিজের হাতে সাজিয়ে দেওয়ার আনন্দ, নিয়ন-এর আলো আর একটা আধপোড়া শহর । মানে এই শহরটার কথাই বলছি । আর বলছি ওই তিন মদ্যপের কথা ছবিতে যাদের দেখা যাচ্ছে । ওরা হেঁটে চলেছে ...

1। টলটলে জল বিন্দু ; ঝরে পড়বে- কয়েক সেকেন্ড মাত্র, টুকটুকে লাল আপেল যেভাবে ঝরে পড়ে । এখনো বাকি কয়েক সেকেন্ড, ঠিক যেভাবে ঝরে পড়ে নিমফল । নিঃশব্দ নয়, ঝরে পড়বে ঢেউ হয়ে, নিস্তরঙ্গ জলে আলোড়ন তুলে এক ফোঁটা উপবৃত্তাকার গোলক, সারফেস টেনশন ছিন্ন করে এক ছোট্ট স্ফটিক বিন্দু এখুনি ঝরে পড়বে, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড । 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

2। একটা মাত্র টিমটিমে মোমবাতি, টেবিল-জোড়া প্রসাধন আর ধুলো, একমুখ ধোঁয়া, গলগলে ঘন ধোঁয়া গিলছে রসালো জীবন, গড়িয়ে পড়ছে রস, চটচটে ফেনার মত রস কষ বেয়ে নেমে আসছে শীতল হিমবাহ হয়ে ।

3। একটা দরজার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে দামী বৈদ্যুতিক আলো, সাদা মনোরম আলো । কেউ কোথাও নেই , শুধু নির্মল, সাদা আলো । পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু অপরিহার্য সাদা বৈদ্যুতিক আলো । দরজার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে আসা একমুঠো আলো । ওটা একজষ্ট ফ্যান না ? ওটা কী ঘুরে চলে সারা দিন, সারা রাত?

4। কাঁচের দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে কে ? ছায়ামূর্তি ? ও কী চায় ? কে ও ? ছিটকিনি কী লাগানো আছে ঠিকমত ? ওর হাতে জ্বলজ্বল করছে ওটা কী ? ও কী দেবদূত ? আগন্তুক ? ছায়ামানুষ ? কে ও ?

5। রাত আমার বড় প্রিয় । একটি রাত একটিমাত্রই স্বপ্নের জন্ম দিতে পারে । রাতের রঙ সাধারণত কালো, ক্ষেত্রবিশেষে তা নিয়নমাখা, তেলচিটে ক্যানভাসে এলোমেলো রঙের ঝড় । আজকের রাত অন্যরকম । আজ জীবন-জীবন খেলা খেলবনা, সেলফোনের বাজনা বাজতে বাজতে হঠাৎ থেমে যাবেনা আজ রাতে । বোতলে জলস্তর যেমন ছিল তেমন থাকবে । আজ রাত একটু অন্যরকম ।

।6। আজ রাতে বার বার মোমবাতি নিবে যাবে । হোক আজ অপচয়, অনেক কাঠি আজ নষ্ট হোক । নিভুক মোমবাতি । আবার জ্বলে উঠবে ঠিক ।

7। দেখতে পাচ্ছ আশেপাশের পাহাড়গুলো কেমন তুলোর মত খসে খসে পড়ছে ?কথা তো ছিলই, ভোর হতেই শিঙা বেজে উঠবে আর পাহাড়-পর্বত-গাছ-পালা সব মিলিয়ে যাবে ...

অন্যদিনের মত বেলা ৮টা আর বাজবেনা । অন্যরাতের মত ঘুমের আগে রঙিন প্রজাপতিরা আদর করবেনা বা বাসিমুখে চুমুও খাবেনা । আজ সকালে সুতীক্ষ্ণ শব্দে তোমার শরীর গুড়ো-গুড়ো হয়ে যাবে । তোমার পথে প্রতিদিনের নুড়ি-পাথর গুলো আজ বদলা নেবে, গাছ থেকে পাখির দল তোমার গায়ে পায়খানা করবে। আর তখন তোমার কার কথা মনে পড়বে ? তোমার মা ?

কার মা ? সেই বিছানা, সেই ঘুম, সেই শব্দ, সেই কান্না ? ভেজা ভেজা সেই বিছানা ? সেই খাট , যার চারটি পা ? তার ঠিক মাঝে তোমার ঘুম । এ ঘুম তোমার অধিকার, এ ঘুম আমার অধিকার, এ ঘুম আমাদের সকলের অধিকার ।

FOUND IN THE LOST

Sudipta Paul.

He may have lost many battles.
Some say losing is its destiny.
Some say it is its character.
But who could it be that is never lost..
Eternal and blissful..
The life beyond mere life..
Death beyond material death?

He lies broken and shattered
Untouched by the dawn of light and knowledge.
Drowning in an unending pit of dark
Devoid of hope....
But...there is a flame that still flickers

Is that the light of radiance?
Or is it the light that establishes the truth of darkness?
Passion and pleasure fills the air with its stench...
Breaking bones, tearing the mind into a million pieces.

Who is it that has still not been lost?
Strong and unvarying?
Who is it?

-

Yes, I may have lost,
But IT is beyond winning and losing.
Yes, I may not know the truth,
But the absolute truth is That in itself..
Yes I may witness only darkness ,
But That, is light in its ownself..

Beyond the beginning
Beyond the creation
Beyond the advent of words
Beyond the ripples of feelings
Beyond the existence of life
Beyond the unavoidable death
Beyond the end of endings
Only that One exists – Love..

Love, the Oneness in all separation..
Love, the Oneness in all disparity..
Love, the Oneness of All and beyond..
Beyond the fathomless Eternity..
Beyond the Oneness of singularity...
The eternal play of the One,
It ends up in finding the same depth in each,
And ends up in establishing there is no other..
He loses It again and again to find the same reflected back in the Self,
Just to witness the Oneness in the never-ending ocean of bliss.

-

Durga Puja for a Bengali

Binita Sengupta

What is Durga Puja for a Bengali? You just ask this question to a Bengali in any part of the world and you can see their face instantly light up. This is the only festival that is celebrated with such opulence and extravagance that words fall short, the enthusiasm is beyond words.

The preparation for the pujo starts “definitely” with the planning for shopping, atleast a month or two before. Yes……. obviously!! Otherwise, nothing will be completed. The newest fashion trend, the sarees, hurrying to the tailors, making appointments ahead of time so that the stitching can be done and finished before hand, matching jewellery, and running to the bank's lockers to have everything ready in time. During the puja days, there will be guests at home and so many things to be done then.

How many dresses to buy and what should be worn when and on which days!! No repetition of dress is allowed. Your work and shopping schedules are both too busy. Shopping for oneself is important, but we also have a lot of other people on our list. The list is enormous, and it gives immense pleasure to buy for your loved ones. Maa, Baba, Thakuma, Dadu, Kids, Pisi, Masi, Meso….. the list is endless…… not to miss out the maids who will keep you reminding that they need it early for getting their blouses stitched. Oh God, so much work to do.

Now after the dress is planned, we now move onto pujor Khabar (Dishes to be made during puja). It differs significantly from the Navratris celebrated by the majority of the non-Bengali community, who fast for these nine days before breaking their fast on Navami. Instead, we Bengalis celebrate this pujo with as many meals as we can think of, from morning dishes like luchis and aaloo dum to numerous vegetarian and non-vegetarian delicacies. For Bengalis, Durga Puja is an annual festival, funfair and occasion where everyone comes together to celebrate, shop, eat, visit pandals and much more. It is celebrated as the homecoming of Maa Durga to her parents place on earth and just like when a daughter returns home, family and friends congregate to celebrate by indulging in delicious foods rather than fasting. Fasting is done on all the days, till the pushpanjali is done in the pandals.

Pandal hopping during the pujas multiplies the fun, new dress, new fashion, swaying to the tunes of all the famous Bengali songs, it is such a feat to relive our culture for the four days of puja. Every pandal has a different event for the evening which is a treat to watch, the variety of stalls is another attraction for visit & of course the decoration & Maa Durga.

Maa Durga means Shakti, the Mahishasurmardini!! The epitome of all the power of the universe engulfed in one. It gives great pride & pleasure to imagine that all the Gods handed over their weapons to Maa Durga with a belief that “She” will protect everyone from the demons who were causing trouble. She fought the demons to re-establish peace and sanctity on earth again.

Wow!!! If I were to imbibe any one character in myself, it will definitely be Maa Durga, the epitome of Shakti. Durga Puja symbolizing victory over evil, is an experience evoking a wide range of thoughts and emotions. Swami Vivekananda best explained the worship of the image of Durga, “the Hindu does not worship an idol made of clay and wood, he sees consciousness within the earthiness and loses himself in it.”

Endless - Yudhajit Bhattacharjee

মহালয়া: আগমনী সুর

অমিতাভ ব্যানার্জী

কাল কে ভোরে মহালয়া, জাগতে হবে রাতে,
আসবে না ঘুম শুলেও জানি, পুজোর খুশির টানে ।
উদাস মনে আঙিনা জুড়ে আজ দুর্গার পদধনি,
দোদুল মনে সুরের ছলকে গাইছে আগমনী ।
সবার আবেগ এক হয়ে আজ, বাজে আগমনী সুরে ,
কাশের বন মত্ত হবে তোমার আগমনে ।

সাদা রঙে ভেজা শিউলির বনে লাগে শিশিরের দোলা ,
তবুও সে বনে জ্বলে মাঝে মাঝে, হিংসার আগুন শিখা ।
অসুরটা কখনো হিঙ্গস্র হয়ে ভাসায় রক্তস্রোত ,
হিংসা জ্বালিয়ে হত্যালীলায় ভোলায় মনুষ্যবোধ ।
তাই অসুর বধের রচিত কাব্য বাজে আগমনী সুরে ,
ভোরের শিশিরে ভিজে যাওয়া ঘাস, মত্ত তোমার আগমনে ।

বাঁধ ভাঙা জল ডুবিয়ে প্রান্তর যার হারায় সব কিছু ,
বেসেছো ভালো তাদের তুমি যারা দিন হীন কৃষক শিশু।
চড়া দামের মন্দা বাজারে যারা থাকে আধপেটা ,
তোমার আগমনে ভোলায় দুঃখ, যারা আছে ঘর ছাড়া ।
তাদেরও মুখে ফোটাও হাসি, যাদের নেই স্থান সমাজে ,
বেঁচে আছে তারা তোমার স্মরণে , যারা লাঞ্ছিত মনিপুরে ।
অকালবোধনে দুষ্ট-দমন তাই লেখা আগমনী সুরে,
'রূপং দেহি জয়ং দেহি' - আজ প্রাণে বাজে, তোমার আগমনে ।

ভালোবাসা প্রেম ভুলে গিয়ে যারা, করে শুধু কোলাহল,
পুজোর দিনেই মিলে মিশে যাক, সব ধর্মের কোন্দল ।
খুশিতে ভাসে শালুক শাপলা, শিউলি খায় লুটোপুটি,
মেঘের দল নীল আকাশ জুড়ে কাটে কত আঁকিবুকি ।
পুজোর ছুটির চিঠি নিয়ে আসে ভোরের নতুন আলো,
সেই চিঠিতেই লেখা থাকে শুধু আনন্দ মুঠো মুঠো ।
আছে যতদিন এই পৃথিবীতে আছে সঞ্চারী প্রাণ,
বছর বছর পুজোর দিনে, শুধু ভালোবাসা পাবে স্থান ।
শ্রাবন অবসান অশ্বিন বরণ মত্ত আগমনী সুরে,
দিক দিগন্ত সুরভিত আজ, আজ তোমার আগমনে ।

Hanukkah: The Jewish Diwali?

Yudhajit Bhattacharjee

Often in life we experience something which we call magical and it lasts through our memory forever. During my stay in Israel (known as The Holy Land) I witnessed some of the most unique and spectacular festivals, which the rest of the world are oblivious from. One such festival is “Hanukkah”. Well, those who are ardent fans of the American TV series “Friends” must have heard about this Jewish festival. I had the once-in-a-lifetime opportunity to experience this at its most authentic form and at its place of origin- Jerusalem; the holy land for all Abrahamic religions. My photographer friends and I decided to make complete use of this lucky chance and decided to step up this experience and travel to Mea Shearim. It is the most insular human habitat (well, not as insular as Andaman Islands where Jaroa and other tribes live) , where residents still adhere to 19th-century beliefs and orthodox Jewish traditions. “Mea” means “hundred” in Hebrew and “Shearim” means “gate”. So, this place used to have a hundred gates and hence got the name.

Oh wait, Let us first hear about the festival, shall we?

So, Hanukkah, also spelt as Chanukah, is a significant Jewish festival lasting for eight days during the winter season. It is often referred to as the "Festival of Lights" due to its nightly menorah lighting, accompanied by special prayers and the consumption of fried food (Sufganiyah). The term "Chanukah" derives from the Hebrew word for "dedication", reflecting its purpose of commemorating the rededication of the Holy Temple. In its proper pronunciation, the Hebrew word includes a distinctive guttural "kh" sound, articulated as "kha-nu-kah."Little about the place? or else things won’t be articulated rightly. Established in 1874 by a collective of 100 individuals, Mea Shearim stands as one of the earliest Jewish settlements situated beyond the confines of Jerusalem's Old City walls. Notably, Mea Shearim earned the distinction of being the first quarter in Jerusalem to be illuminated by streetlights, primarily inhabited by Haredi Jews and was originally established by the Old Yishuv. The streets here exude the atmosphere of a traditional eastern European shtetl. Daily life revolves around the unwavering commitment to traditional Jewish customs, fervent prayers, and the devoted study of Jewish religious texts.

Now let’s get back to sharing my experience. We arrived at Mea Shearim in the middle of this eight day long festival, where candles are lit for each day. We entered the neighbourhood which was silent but gorgeously illuminated

beautiful menorahs. It was a bit risky to click photos as they are not always the most open to the outside modern world, and also prohibit the usage of any sort of modern including being photographed. We knew there will be consequences if we are met with some sort of resistance. We had heard previous instances where the locals had thrown stones at photographers (a bit scary, isn't it?). However, this also made the experience all the more adventurous and fascinating. We went around the town and clicked cautiously. Every house was minimalist in its charm and around the courtyard there were people holding theirholy book and praying. I suddenly came across a little girl holding a toy camera who looked at me with amaze and it made for a brilliant frame as she was standing right beside the menorah! I clicked, and she disappeared inside the house in a whisker. Nice shot, I thought and pat my shoulder.

As we strolled around the neighbourhood, we were mesmerized by how beautifully each and every house was decorated and I tried to capture the sights with my camera as much as I could. Suddenly we came across a small corner where things were decorated in a more Christmas-y fashion. Might be some American Jews, we thought to ourselves. The décor here was a bit elaborate but still pretty. A fluffy red mushroom and some tasty Sufganiyah was on offer. I took one (of course !). We met a few fellow photographers who had come from around the world to experience this amazing place and festival.

On the next turn we encountered something very special, a group of Americans along with children, singing a very beautiful song called "Ya'aleh V'yovoh" a classic Hanukkah song; you can listen to the song on YouTube.

Some of them were playing the guitar, some were beating the hand drums and they all were singing and rejoicing. Indeed, a spectacular view to remember forever. A frame consisting of all these people along with the beautiful menorahs was a treat to the eyes. The soul and symphony of the ambience are beyond my ability to express in words. We roamed around the scene trying to click as much as possible. Unfortunately, my camera ran out of power after a point and I missed some of the amazing frames I would have loved to capture, but nevertheless, they will be forever etched in my memory. We walked out of the neighbourhood keeping the melody and muse in our minds and hoping to come back someday to bag some more beautiful memories.

The Foe Of Pride

Madhurima Jana

Pride, they say takes birth with you.
Takes a seat and holds out it's hand in glee.
And when you've learnt you have a name.
You latch on to it's fingers before you see...
You've taken on a world of loss,
A weight that doubles each time you wish,
You lose as much as you acquire, and more,
And the effulgent truth, by a hair you miss

Growth just passes like a storm.
It takes and breaks along its path.
And time just slips through your nimble fingers,
As you wonder why fate has shown such wrath.
You think it's you, but do you ever notice
Through the corner of your lazy eyes
That Pride sits right there at the foot of your bed,
And lulls to sleep, your anxious cries

And if you pass your life in the wake,
Of Pride being your friend and guide
You will have seen it in your mirror too
With mouthfuls of vanity and wide open eyes.
And if it so be that the vessel of truth
May have sprinkled a drop or two on you
It has surely struck you like a bolt of blue
That you have let that Pride name You.

But truth does not play with false virtue,
It sheds light on the timeless and the filthy too.
It rips apart your ignorance,
And fills you up in the pulsating hue
Of that which neither lives nor dies,
And that which creates and destroys,
That which builds and makes and breaks,
All dreams and waking steps one takes.

Once, just once if you've caught a whiff
That all that you know and all that you miss
Is not your name and not your pride
It is just You and all that is.
That which drowns all of dark,
That which beams with entirety true ,
That which will holds and lets go of all,
That which will free you from your false You.

-

Light and shadow - Tanmoy Sarkar

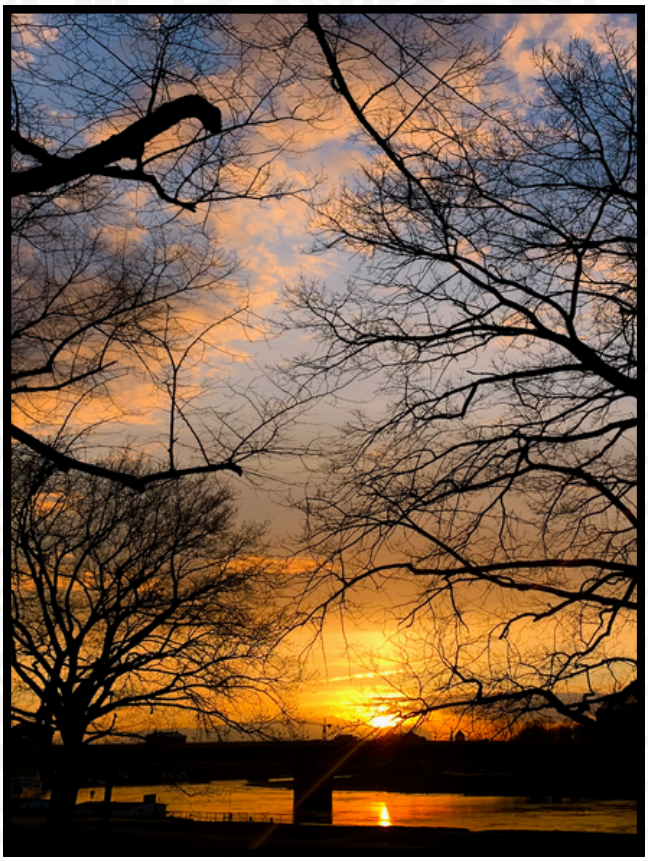

Dispelling the shadows - Binit Syamal

দুগ্গা দুগ্গা

শূন্য

আজ শনিবার, মহালয়া। সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে নন্দিতাও মহালয়া শুনছে। সেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায়, "আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির...' - তফাৎ শুধু একটাই। রেডিওর বদলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলা ভেসে আসছে ওর ল্যাপটপ থেকে। সুদূর জার্মানিতে বসে এছাড়া আর গতি নেই। মহালয়া শুনতে শুনতে নন্দিতার স্মৃতির সমুদ্র থেকে ভেসে উঠলো কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট অনেক স্মৃতি, আর সেই স্মৃতির ভিড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল নন্দিতা।

- কিরে! ওঠ! চারটে তো বেজে গেল। এই মেয়েকে নিয়ে আমি আর পারিনা! ওঠ! ওঠ! তুই ছাড়া সবাই উঠে পড়েছে। - এইটুকু বলে দিপালী নন্দিতাকে ঠেলা দিয়ে ওঠানোর চেষ্টা করল। দিপালী অর্থাৎ নন্দিতার মা। দশ বছরের নন্দিতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন জড়ানো দৃষ্টি নিয়ে কোনরকমে মার দিকে তাকিয়ে করুন মুখে বললো - আর পাঁচ মিনিট মা, আসছি। সেই 'পাঁচ মিনিট' বাদে যখন সে উঠলো তখন দেবী মহিষাসুরকে শুলে বিদ্ধ করেছেন!

নন্দিতা ঠিক করে ফেলেছে যে সে আর জীবনে কবিতার সাথে কথা বলবে না। এতদিন ধরে ওরা দুজনে মিলে প্ল্যান করল - যে অষ্টমীর দিন ওরা দুজনে বেরোবে - আর কবিতা কিনা ditch করলো ওকে! তাও আবার ওই সান্তনুর জন্য! এই বন্ধুত্বের নমুনা! দরকার নেই এমন বন্ধুর! আসুক, কলেজ খুললে নোটস চাইতে - তখন বোঝা যাবে কে সত্যিকারের বন্ধু।

- সোজা হয়ে দাঁড়া, কুঁচিটা করতে দে!
- তাড়াতাড়ি কর না দিদি, ওদিকে সবাই প্যান্ডেলে চলে গেল। তোর এই কুঁচির ঠেলায় আমার আর যাওয়া হবে না!
- কুঁচিটা ঠিক করে না করলে প্যান্ডেলে গিয়ে যদি খুলে যায়, খুব ভালো লাগবে?
- ধ্যাত! তোর শুধু বাজে কথা, খুলে যাবে কেন! ভালো করে সেফটিপিনটা লাগিয়ে দে!
- এত তাড়া কেন করছিস! তোর কি মনে হয় আমি বুঝিনা! প্যান্ডেলে যাওয়া তো ছুতো। শাড়ি পড়ে অর্জুনকে ইমপ্রেস করতে হবে না!
- বেশি তাড়া দিলে মাকে বলে দেব!
- দিদি-ইই!
- আচ্ছা! ঠিক আছে।

দিম্মার থেকে ধার করা সাদা লালপাড় গরদের শাড়িটা কিন্তু জমে গেছে। একেবারে সুপারহিট। কৌশিক বলেছে তোমাকে না আজ ভীষণ সুন্দর লাগছে। পুরো রাত এক মুহূর্তের জন্য ওর হাত ছাড়েনি। সারারাত ঘুরে ঠাকুর দেখাটা এ বছর একটু স্পেশাল।

- শোন, মেনু টা ঠিক করে ফেলেছি! সপ্তমীর দিন সকালে কচুরি আর আলুর দম, দুপুরে বিরিয়ানি, বিকেলে ফুচকা আর রাতে ওই হালকা রোলের উপর চালিয়ে দেব। অষ্টমীর দিন সকালে নিরামিষ --

তাই লুচি ধোকা এগুলো খেয়ে নেব। রাতের বেলা ভাবছি মাটন চাপ আর পরোটা সঙ্গে দু-একটা ফিশ ফ্রাই। নবমীতে বস মাংস, পোলাও, চাটনি আর রসগোল্লা। দশমীতে ওই নিমকি আর মিষ্টি তো ফিক্সড আর রাতে চাইনিজ।

- ওরে পেটুক তুই থাম। পুজো না পেট পুজো বোঝা যাচ্ছে না! তুই যা ফিরিস্তি দিচ্ছিস তাতে জেলুসিল টা অ্যাড কর। না হলে সোজা হসপিটাল।

- একটাও যদি মিস যায় না পৃথা!!!

- তথাস্তু দেবী। আপনার এই লিস্ট পূরণ করতে আমি প্রাণ ও দিতে রাজি!

ইমন আর পৃথার মেসেজ গুলো পড়তে পড়তে নন্দিতা হেসে ফেলল। ইমন পারেও বটে, গোটা পূজোয় কি খাবে তার লিস্ট টা করে ফেলেছে। আর এতে যদি ওরা সঙ্গ না দেয়, তবে নেক্সট ৭ দিন ইমনের মান ভাঙাতে ওদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

দিদি এখানেই নেমে যেতে হবে। আর গাড়ি যাবে না। এই দেখছেন না সামনে প্যান্ডেল হচ্ছে।

- দাদা পাশের গলি টা নিন না।

- যাবে না দিদি! চারিদিকে প্যান্ডেল! নেবে হাঁটতে হবে। আমি রাইডটা এন্ড করে দিচ্ছি। আর যাবে না!

অগত্যা নেমে পড়ল নন্দিতা। এই এক ঝামেলা। পুজোর আগে কলকাতায় গাড়ি করে কোথাও যাওয়া, প্রচন্ড মুশকিল!

- রুনুদি, তুমি নারকোলের ছইটা পাক দাও। আমরা না হয় সবাই মিলে পাকিয়ে দেব। তোমার মতো নাড়ুর পাক আমাদের দ্বারা হবে না।

রুনুদি অর্থাৎ নন্দিতার জেম্মা। ওরা সবাই এসেছে ওদের দেশের বাড়ির পুজোয়। সরিকি পুজো - ওদের পালা পড়ে প্রতি পাঁচ বছর। প্রচুর প্রস্তুতি - আর এসবের দায়িত্বে রয়েছে ওর জেম্মা। একা হাতে পুজোর ভোগের রান্না, জোগাড়, বাজারের ফর্দ মেলানো এবং সবাইকে তাড়া দিয়ে কাজ করানো - সবই সমান ভাবে সামলাচ্ছে জেম্মা। নন্দিতাদের ভাই বোনেদের কাছে জেম্মাই দশভূজা দুর্গা। নন্দিতারা বসে পদ্মফুল ফোটাচ্ছে। ছোটদের অকাজ থেকে আটকানোর জন্য জেম্মার এই ব্যবস্থা। নন্দিতা কিন্তু খুব খুশি। সেজদা অগ্নির সঙ্গে কম্পিটিশন দিয়ে পদ্মফুল ফোটাচ্ছে। ওকে জিততেই হবে।

"ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়্যৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়্যৈ ..." - মন্ত্রটা শুনছিল নন্দিতা, কোনরকমে বলছিলও, কিন্তু তাতে তার মন ছিল না। হাতে ফুল নিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময়, বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছিল দুর্গা দালানের সামনের ফটকের দিকে। এত দেরি করছে কেন! অঞ্জলি তো শেষ হয়ে যাবে! অবশেষে ওর মুখে হাসি ফুটল। ওই তো এসে গেছে! সেই বছর অষ্টমীর অঞ্জলি দুবার দিয়েছিল নন্দিতা। অবশ্য কোন বারই পুরো মন দিয়ে দেয়নি। দেবী দুর্গা কিন্তু ভুল ত্রুটি সব ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। উনি তো অন্তর্যামী - তাই বুঝেছিলেন নন্দিতার হৃদয়ের গোপন কথা।

এই শোন - মা-বাবা থাকছে না - আমার বাড়ি ফাঁকা- অষ্টমী রাত তাহলে আমার বাড়িতে।- রাঘবের এই কথায় সবাই হৈ হৈ করে উঠল। সবাই বলতে ওরা ছ'জন - রাঘব, অমৃতা, সৌমাল্য, অভি আর নন্দিতা - প্রেসিডেন্সি কলেজের ফার্স্ট-ইয়ারের ব্যাচমেটস।

-beer তুই তুলে নিস ভাই। আমার পাড়ায় কেনা চাপ।

-ঠিক আছে বস!
-এই নন্দিতা! তুই তোর জামাইবাবুকে ম্যানেজ করে একটা হুইস্কি আনতে পারবি?
-পারব। রাহুলদা খুব cool। দিদিকে লুকিয়ে দেবে বলেছে।
- All set তাহলে! কলেজের বন্ধুদের পুজো তো আর dry হতে পারে না!

-বাবা! রাস্তায় কি জ্যাম! - বলতে বলতে নন্দিতা কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। কলেজের গন্ডি পেরিয়ে ওরা এখন সবাই চাকরি করছে। বন্ধু দলের সংখ্যা অবশ্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুজোতে ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখার ইচ্ছে কারুর আর তেমন নেই। একজনের বাড়িতে গ্যারেজ হয়ে বন্ধুরা মিলে পূজোর চারটে দিন কাটিয়ে দেয়। দেবীর সাথে আগমন আবার তার সাথেই গমন এই বছর অবশ্যই দুজন কম। সূর্য আর অমৃতা আমেরিকায়। তবে ভিডিও কলে জয়েন করবে। এই আড্ডা পুরো মিস করতে ওরা নারাজ।

আচ্ছা, এই বছর কি হবে আড্ডার? কলকাতায় তো এবার শুধু অভি আছে। বাকি সবাই তো বাইরে - পৃথিবীর বিভিন্ন কোনায়। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হবে আর কি! ভিডিও কলই ভরসা। সারা বছর নিজেকে মানিয়ে নিলেও এই সময়টায় মনটা কেমন করে ওঠে। নন্দিতা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে - দিদি আলপনা দিচ্ছে, জেম্মা শাড়ি গাছ কোমর করে ভোগ রান্না করছে, মা নাড়ু পাকাচ্ছে, অভি আর সৌমাল্য বিয়ার গুলো ফ্রিজে ঢোকাচ্ছে, ইমন মেনু ঠিক করছে পৃথার সাথে, অমৃতা আর সূর্য একটু দূরে বসে গল্প করছে, কবিতা আর সান্তনু অঞ্জলির ফুল গোছাচ্ছে, দিম্মা চাবির গোছাটা পিঠে ফেলে সবাইকে নিমকি দিচ্ছে, দালানের বাইরে প্রচুর চটি- মায়ের টানে সবাই এক জায়গায় এসেছে।

একটা আওয়াজে ঘোর কাটলো নন্দিতার। কিসের আওয়াজ? - শঙ্খ ধ্বনি! - ধুর! - ওয়াশিং মেশিনের buzzer! উঠে পড়ল নন্দিতা। প্রচুর কাজ। বিদেশে আর যাই থাক মালতি মাসি আর স্বপন কাকুরা নেই। তাই আপনা হাত জগন্নাথ! কাপড়গুলো মেলতে হবে। কৌশিক বাজারে গেছে, ফিরে এলে রান্না করতে হবে। এখানে আবার রোববার সব দোকান বন্ধ তাই শনিবারেই সপ্তাহের বাজারটা করে রাখতে হয়। হঠাৎ ওর মোবাইল ফোনে একটা নোটিফিকেশন এলো। ফেসবুকের পোস্টটা খুলতে খুলতে নন্দিতা খেয়াল করল ওদিকে ইউটিউবে মহালয়া শেষ হয়ে পরের ভিডিওটা চলছে। সেই শালিমার এর বিজ্ঞাপন- 'এই প্রাণঢালা উৎসবে বারবার, আলো আশা ভালবাসা মিশে একাকার...'। ওর মন কেমনের ভাবটা কিছুটা যেন বাড়িয়ে দিল গানটা। কিন্তু ফেসবুকের পোস্টটা খুলেই নন্দিতার মুখে ফুটে উঠল হাসি। বঙ্গোৎসব ড্রেসডেনের পোস্ট - 'ড্রেসডেনএ মা আসছেন কুমোরটুলি থেকে'। মন খারাপটা নিমেষ কোথায় উধাও হয়ে গেল । ও দেশে যেতে পারছেনা তো কি হয়েছে, ওর প্রাণের কলকাতা কে নিয়ে স্বয়ং মা আসছেন ওর কাছে। এবার পুজোয় জমবে মজা!

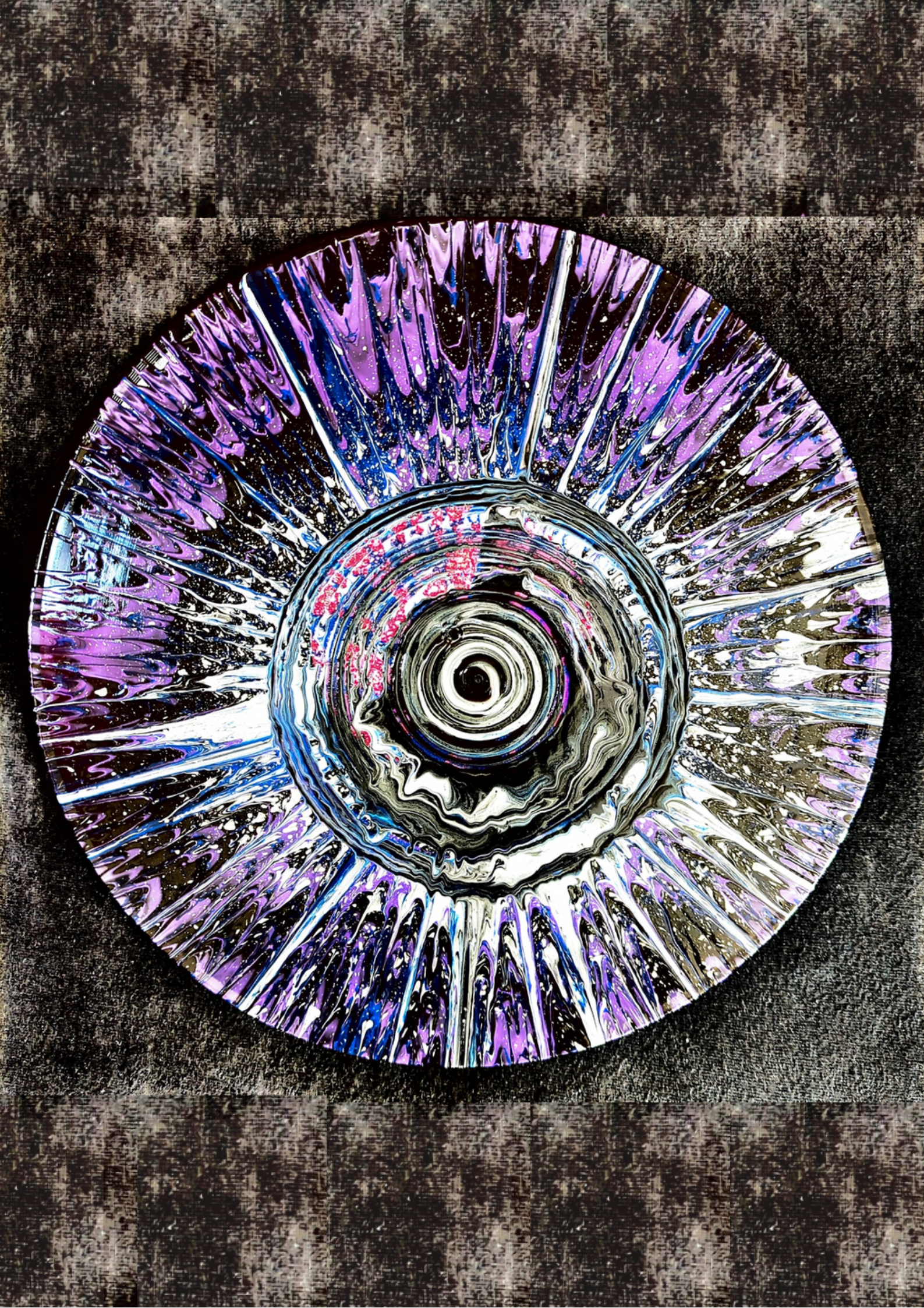

বঙ্গোৎসব ড্রেসডেন

BONGO UTSAV DRESDEN e.V.